আবুল হুসেনের জীবন ও সাহিত্য

মোঃ নাজমুল হক রহমানী

Dhaka University Library
382695

382695

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য
উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ডিসেম্বর ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ নাজমুল হক রহমানী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে আমার তত্ত্বাবধানে "আবুল হুসেনের জীবন ও সাহিত্য" শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে পরীক্ষণের জন্য উপস্থাপন করছেন। তাঁর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৩৯৩/৯২-৯৩ (পুন:)।

তাঁর এই অভিসন্দর্ভ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোনো ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত হয়নি এবং এর কোনো অংশ কোথাও ছাপা হয়নি।

২১. ৯. ২০০০

(অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

382695

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এবং বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মনীষীদের সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আমি প্রথম পরিচিত হই—খোন্দকার সিরাজুল হকের লেখা থেকে। তখন আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. (১৯৮৩-৮৪) ক্লাশের ছাত্র। এ সংগঠনের সঙ্গে জড়িত প্রায় সকলেই একালে কমবেশী আলোচিত হয়েছেন। আবুল হুসেন ছিলেন এ আন্দোলন এবং সাহিত্য সমাজের প্রধান পরিচালক। অথচ তিনি আজও অবহেলিত । কেন তিনি অবহেলিত ? এ প্রশ্ন থেকেই আমার মনে ইচ্ছে জাগে 'আবুল হুসেনের জীবন ও সাহিত্য' বিষয়ে কাজ করার।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষে এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হই। আমার এই অভিসন্দর্ভ রচনার কাজে সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন । অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ সঠিকভাবে পরিচালনা এবং নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করার জন্য তিনি আমাকে যেভাবে উৎসাহ, প্রেরণা এবং উপদেশ দিয়েছেন—তার তুলনা বিরল। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহারের অনুমতি প্রদান ছাড়াও অনেক তথ্য-সমৃদ্ধ দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

382695

'আবুল হুসেনের জীবন ও সাহিত্য' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি রচনার কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে আমার তত্ত্বাবধায়ক ছাড়াও আর যাঁদের সহযোগিতা এবং উপদেশ পেয়েছি —তাঁরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. ওয়াকিল আহমদ, অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ও অধ্যাপক ড. সাঈদ-উর রহমান। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মহাম্মদ দানীউল হক, কুমিল্লা সরকারী ভিক্টোরিয়া কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. জয়নাল আবেদীন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রভাষক জনাব মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান। তাঁরা তাঁদের সুচিন্তিত পরামর্শ এবং ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

আমাকে সাহায্য করেছেন। এজন্য তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা।

এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তি থেকে আরম্ভ করে অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা ও গবেষণাপত্রটি দাখিল করা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করে রাখলেন বন্ধু ড. গোপিকারঞ্জন চক্রবর্ত্তী। তাঁর কাছে আমি চিরঋণী এবং সর্বোপরি তাঁর স্ত্রী অধ্যাপিকা সুচিত্রা রাণী মোদকের কাছেও।

বর্তমান অভিসন্দর্ভটি রচনা করতে গিয়ে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমীর গ্রন্থাগার এবং বাংলা বিভাগের সেমিনার গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। উল্লেখিত গ্রন্থাগারসমূহের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আবুল হুসেন রচনাবলী, ১ম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত রচনাসমূহের উপর ভিত্তি করে আমি অভিসন্দর্ভটি রচনার কাজ সম্পন্ন করেছি। রচনাবলীর ১ম খণ্ডের শেষে ২য় খণ্ডে প্রকাশের জন্যে একটি তালিকা দেওয়া হলেও সেগুলো আজও দুস্প্রাপ্য বিধায় গবেষণা-কর্ম আবুল হুসেন রচনাবলী ১ম খণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হলো।

সবশেষে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সতর্কতার সাথে অভিসন্দর্ভ কম্পিউটারে কম্পোজ করার জন্য আমি মোঃ মকবুল হোসেনকে মোবারকবাদ জানাই ।

মোঃ নাজমুল হক রহমানী
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	:	আবুল হুসেনের জীবন, শিক্ষা ও দেশ-কাল	১-৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	সাংগঠনিক কার্যক্রম: 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন	১০-২১
তৃতীয় অধ্যায়	:	ধর্ম-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কার বিষয়ক চিন্তা	২২-৪৬
চতুর্থ অধ্যায়	:	শিক্ষা-চিন্তা	৪৭-৫৮
পঞ্চম অধ্যায়	:	সাহিত্য-চিন্তা	৫৯-৬৪
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	সংস্কৃতি-চিন্তা	৬৫-৭৫
সপ্তম অধ্যায়	:	অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ক চিন্তা	৭৬-৮৯
অষ্টম অধ্যায়	:	আইন বিষয়ক চিন্তা	৯০-৯৬
নবম অধ্যায়	:	মনীষীদের জীবন-সাধনা বিচার	৯৭-১০৩
দশম অধ্যায়	:	ছোটগল্প ও নাটক	১০৪-১১২
একাদশ অধ্যায়	:	উপসংহার	১১৩-১১৪
গ্রন্থপঞ্জি	:		১১৫-১১৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

আবুল হুসেনের জীবন, শিক্ষা ও দেশ-কাল

আবুল হুসেন ১৮৯৭ সনের ৬ই জানুয়ারি (২৩শে পৌষ, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ) যশোহর জেলার পানিসারা গ্রামে নানার বাড়িতে জন্ম গ্রহণ করেন।[১] পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে আবুল হুসেন সবার বড়, দ্বিতীয় ভাই হোমিও-প্যাথিক ডাঃ সৈয়দ রেজাউল হুসেন, তৃতীয় সৈয়দ ইমামুল হুসেন এম.এ., চতুর্থ সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন এবং ডাঃ মারুফ হোসেন সবার ছোট।[২] তাঁর পৈত্রিক নিবাস যশোহর জেলার ঝিকরগাছা থানার কাউরিয়া গ্রাম। আবুল হুসেনের পিতার নাম হাজী মুহম্মদ মুসা এবং মাতার নাম আসিরুন্নেসা । পিতামহ মৌলভী মোহাম্মদ হাশিম ও মাতামহ মীর লুৎফে আলী। পিতামহ মৌলভী মোহাম্মদ হাশিম এর ন্যায় তাঁর পিতা মুহম্মদ মুসা ধার্মিক ও জ্ঞানসাধক ছিলেন। মুহম্মদ মুসা *নামাজ শিক্ষা* নামে একটি বই রচনা করেছিলেন। সেকালে বইটি পাঠক সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল।

সত্যনিষ্ঠ ও সুদৃঢ় চরিত্রের অধিকারী পিতামহকে আবুল হুসেন ব্যক্তি-জীবনে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন।[৩] পিতামহ প্রসঙ্গে আবুল হুসেন 'সুফী হাশিম' প্রবন্ধে (১৩৩৩) লেখেন, "হাশিম অতি সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। জীবনে তিনি কখনও ইসলাম-গর্হিত কাজ করেন নাই। ---- তাঁহার নির্মল চরিত্র, সৎ-সাহস, হৃদয়ের তেজ ও জ্ঞান পিপাসা দেশ-কাল নির্বিশেষে অনুকরণীয়। ----তিনি মুসলমান সম্প্রদায়কে জ্ঞানী ও শিক্ষিত করিবার জন্য উপায় উদ্ভাবন করিবার চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। মুসলমানকে কিরূপে শিক্ষিত করিলে তাহারা প্রকৃত মুসলিম ও চরিত্রবান মানুষ হইতে পারিবে, সেই ছিল তাঁহার চিন্তার বিষয়।"[৪] আবুল হুসেনের মাতা আসিরুন্নেসা ছিলেন পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। তাই মাতামহের মৃত্যুর পরে মাতার বিশেষ অনুরোধে আবুল হুসেনের পিতা মুহাম্মদ মুসা শ্বশুরালয়ে বসবাস করতে শুরু করেন। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।[৫]

আবুল হুসেনের শিক্ষা জীবন শুরু হয় পানিসারা গ্রামের পাঠশালায়। পাঠশালার শিক্ষার পাশাপাশি তিনি বাড়িতে পিতার সান্নিধ্যে থেকে আরবি, উর্দু ও ফারসী ভাষা আয়ত্ত করেন। প্রথমে তিনি যশোহরের ঝিকরগাছা গ্রামের এম.ই.স্কুলে এবং পরে

Dhaka University Institutional Repository

যশোহর জিলা স্কুলে ভর্তি হন। তিনি "১৯১৪ সনে মাসিক ১০ টাকা বৃত্তি পেয়ে যশোহর জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। এ সময়ে জিলা স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন কাজী আনোয়ারুল কাদীর। (পরবর্তীকালে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' তথা 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের' অন্যতম প্রবক্তা হিসেবে আমরা কাজী আনোয়ারুল কাদীরকে পাই)। আবুল হুসেন ঐ বছরেই (১৯১৪) কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯১৬ সনে বৃত্তিসহ আই . এ. পাশ করেন। ১৯১৮ সনে একই কলেজ থেকে তিনি বি. এ. পাশ করেন এবং ১৯২০ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন।"[৬] আবুল হুসেন বরাবরই পড়াশোনায় মনোযোগী ছিলেন এবং ছাত্র জীবনে অসাধারণ মেধার পরিচয় দেন-যার প্রকাশ তাঁর শৈশব জীবন থেকে এম. এল. ডিগ্রী লাভ করা পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ কার্যক্রম বিশ্লেষেণ করলে দেখা যায়।

আবুল হুসেনের কর্মজীবন শুরু হয় এম. এ. পাশ করার পরেই। "কলিকাতার হেয়ার স্কুলের সহকারী শিক্ষক পদে তাঁর প্রথম কর্মজীবন শুরু হয়। পিতা-মাতার প্রথম সন্তান হওয়ার কারণে আবুল হুসেনের উপর পরিবারের দায়-দায়িত্ব অর্পিত হয়। সামান্য বেতনে সংসারের ভরণ-পোষণ সম্ভব নয় বলে তিনি অতিরিক্ত পরিশ্রম টিউশনি করতে শুরু করেন।"[৭] সেই সঙ্গে আইন কলেজেও ভর্তি হন। কলকাতা হেয়ার স্কুলের শিক্ষক থাকা কালে আবুল হুসেনের সঙ্গে সাতক্ষীরা জেলার সুলতানপুর গ্রামের শেখ বশির উদ্দিনের কন্যা মোসাম্মাৎ মৌলুদা খাতুনের বিয়ে হয়।[৮] ১৯২১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে আবুল হুসেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে বাণিজ্য বিষয়ে সহকারী লেকচারার পদে যোগদান করেন [৯] এবং কলকাতা ত্যাগ করে সপরিবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ্ মুস্‌লিম হল সংলগ্ন হাউজ টিউটর্স কোয়ার্টারে বসবাস শুরু করেন। এখানেই আবুল হুসেনের বড় মেয়ে হোসনেআরা খালেদা (১৯২৪ সন) জন্ম গ্রহণ করেন। আবুল হুসেনের তিন পুত্র ও তিন কন্যা ছিল। প্রথম পুত্র সৈয়দ ওয়ালিদ হোসেন ১৯২৭ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ শহীদ হোসেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র ব্যারিস্টার আবিদ হোসেন। কন্যা জাহানারা সাজিদা ও মাজেদা খাতুন। [১০]

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি আবুল হুসেন ১৯২২ সনে আইন বিষয়ে বি.এল.ডিগ্রী লাভ করেন। এ সময়ে তিনি ঢাকার 'আল মামুন ক্লাব' ও 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় *তরুণপত্র* (মাসিক) *শিখা* (বার্ষিক) ও *জাগরণ* (মাসিক) এই তিনটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[১১] শুধু বি.এল. ডিগ্রী নিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি আবুল হুসেন, আইনের উচ্চতর এম.এল.ডিগ্রী অর্জনের সংকল্পে সাধনা চালান। এ সম্পর্কে আবুল হুসেনের ছোট ভাই সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন লেখেন, "তাঁর লক্ষ্য ছিল এম.এল. (মাস্টার অব ল') ডিগ্রী নিতেই হবে। চলিল গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশুনা। আমি দেখিয়াছি রাত ১০টার মধ্যে কোর্টের মোকদ্দমার কাজ শেষ করিয়া আহার সমাপন করিতেন। এর পরেই বৈঠকখানার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া রাত ১টা পর্যন্ত এম.এল.পরীক্ষার পড়াশুনায় মগ্ন থাকিতেন। বহু আইন বই, চারটা হাইকোর্টের সাপ্তাহিত ল' জর্নাল টেবিলের তিন পাশে স্তুপীকৃত থাকত। পড়ার সঙ্গে চলিত নোট লেখা, তরজমা করা ইত্যাদি। ১৯২৯ সনে যথাসময়ে পরীক্ষার জন্য কলিকাতা গমন করিলেন। পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল কৃতকার্য হতে পারেননি। মার্কসীট আনার পর দেখিলেন মোট ১৪টা পেপারের মধ্যে একটি পেপারে পাশ মার্ক হইতে ৫ নম্বর কম থাকায় কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ----১৯৩০ সনে দ্বিতীয়বার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিলেন এবং কলিকাতায় গমন করিলেন। পরীক্ষা শুরু হওয়ার দিন হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। অগত্যা বাধ্য হইয়া পরীক্ষা বর্জন করিয়া দ্রুত ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। তৃতীয় বার 'সংকল্প সাধন কিংবা শরীর পতন' এই মন্ত্রে দীক্ষিত আবুল হুসেন ১৯৩১ সনে এম.এল.পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইল। এবার শুধু পাশ নয়, সুনাম ও কৃতিত্বের সহিত কৃতকার্য হইলেন।"[১২] আবুল হুসেনই প্রথম বাঙালি মুসলমান যিনি এম.এল.ডিগ্রী লাভের গৌরব অর্জন করেন। এ প্রসঙ্গে আবদুল কাদিরকে (কবি) দেওয়া এক পত্রে আবুল হুসেন লেখেন, "স্নেহাস্পদেষু, তোমাকে খবরটা না দিলে আমার যা কিছু আনন্দ হচ্ছে, তার পরিপূর্ণ স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে না। এম.এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি বলে কাল বৈকালে এক বন্ধু থেকে খবর পেয়েছি। গেজেট না হলে নিঃসন্দেহ হতে পারছি না। হাইকোর্টের পরীক্ষায় সার্টিফিকেট পেয়েছি। খোদা চাহে তো

Dhaka University Institutional Repository

পূজার পরেই বসবার চেষ্টা করব। একটা ভালো বাড়ির খোঁজ করতে হবে। নজরে পড়ে ত দেখবে। ৫০্ টাকা কি ৬০্ টাকা পর্যন্ত ভাড়া দেওয়া যেতে পারে।"[১৩]

আবুল হুসেনের উচ্চতর শিক্ষার প্রতি এই কঠোর সংকল্প তাঁর ব্যক্তিজীবন তথা কর্মজীবনে সমভাবে অনুভূত হয়। তাই তিনি ১৯২৮ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার চাকুরি ছেড়ে দিয়ে ঢাকা জজ কোর্টে স্বাধীন আইন ব্যবসাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্রি আবাসিক ব্যবস্থা ছেড়ে দিয়ে পুরোনো ঢাকার কলতাবাজারের একটি বাসায় পরিবার-পরিজন নিয়ে আবুল হুসেন বসবাস শুরু করেন। এখানে অবস্থানকালে আইন ব্যবসার পাশাপাশি তিনি স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনায় হাত দেন। আবুল হুসেন সে সময়ে বোর্ডের পুরাতন সিলেবাস পরিবর্তন, আধুনিকীকরণ ও পরিবর্ধনে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আবদুল কাদির লেখেন, "তাঁর রচিত প্রথম পাঠ্যপুস্তক *মুসলিম সাহিত্য-শিক্ষা* ১ম-৪র্থ ভাগ। পুস্তকখানি ৭ম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীর জন্য বোর্ড কর্তৃক অবিভক্ত বাংলার সকল স্কুলের পাঠ্য হিসেবে অনুমোদিত হয়েছিল। তাঁর রচিত অন্য পাঠ্যপুস্তকগুলি হল *সুকোমল পাঠ* ১ম-৪র্থ ভাগ; *নব সাহিত্য-শিক্ষা* ১ম-৪র্থ ভাগ; *বাংলা রচনা ও অনুবাদ শিক্ষা সরল নিম্নগণিত* ১ম-২য়, 'Translation' '*সরল স্বাস্থ্য শিক্ষা*, '*ভৌগোলিক পাঠ*' ইত্যাদি।"[১৪] এ সময়ে আবুল হুসেন নিজের লেখা এবং অন্যের পুস্তক প্রকাশের সুবিধার্থে ঢাকায় 'মডার্ন লাইব্রেরী' নামে একটি পুস্তক বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করেন। পরে এ লাইব্রেরী খুলনায় স্থানান্তর করা হয় এবং আবুল হুসেনের মৃত্যুর পর তাঁর ছোট ভাই সৈয়দ ইমামুল হোসেন এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

১৯২৮ সনে অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে দেয়ার পর ৩ বছর আবুল হুসেন ঢাকায় আইন ব্যবসায় নিয়োজিত ছিলেন। এরপর ১৯৩১ সনে কলকাতা হাইকোর্টে যোগদান করে সেখানে পরিবার নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। আবুল হুসেন এ বছরই (১৯৩১) রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িত হন। আবদুল কাদিরকে (কবি) লেখা একটি পত্রে আবুল হুসেনের এরূপ রাজনীতিতে জড়িত থাকার উল্লেখ পাওয়া যায়, "পলিটিক্স নিয়ে এত ব্যস্ত যে তোমার পত্রের জবাব দিতে পারি নাই। আজ সন্ধ্যায় ফজলুল হক সাহেবের সাথে মোকাবিলা হবে। এখনই সেখানে যেতে হবে। এই অবসরে তোমার পত্রের জবাব দিতে হচ্ছে। আমার

Dhaka University Institutional Repository

'আমাদের রাজনীতি' নামক ও-লেখাটি কত পৃষ্ঠা হয়েছে? তোমার *জয়তীর* ফর্মে থাক্‌লেই হবে। আমার এখানে স্বতন্ত্র ও মিশ্র নির্বাচন সম্পর্কে আর একটা পুস্তিকা বের করেছি। অন্য লেখা কি সত্যই চাও? আমি নাম দিয়ে না বের করলে কোন ফল হবে না বলে দিতে চাই না। আর কিছুদিন পরে বের করতে চাই। তবে কাজেমউদ্দিন সিদ্দিকী সাহেবের বাড়ীতে যে 'সওয়াল জওয়াব' হয়েছিল, সেটা পাঠাতে পারি। যদি চাও, তবে সত্বর জানাবে।"[১৫]

আবুল হুসেনের রাজনৈতিক বেশকিছু প্রবন্ধ এর আগে *দি মুসলিম* ও *মুসলিম স্ট্যান্ডার্ড* পত্রিকায় ইব্‌নে মুসা ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল বলে কবি আবদুল কাদির তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন। 'আমাদের রাজনীতি' (১৩৩৭) প্রবন্ধটি ছিল এর অন্যতম। এ প্রবন্ধটি ছাপা হওয়ার পর আবুল হুসেন আর কোন লেখা ছদ্মনামে ছাপাতে চাননি। ঢাকায় আবুল হুসেন মুসলমান কায়েমী স্বার্থ-বাদীদের দ্বারা যে অবস্থার মধ্যে পড়েছিলেন, কলকাতায় তাঁকে আর ঐ ধরনের কোন সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় অবস্থার শিকার হতে হয়নি। আবদুল মজিদের লেখায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি আবুল হুসেনের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে লেখেন, "১৯৩২-৩৩ সালে তিনি নির্বাচনী 'ভোট যুদ্ধে' অবতীর্ণ হয়েছিলেন যশোহর জেলা বোর্ডের নির্বাচনে। নির্বাচনী প্রচারাভিযানে প্রতিপক্ষ সৈয়দ নওশের আলীর দলের মনোনীত এক প্রার্থী ছিলেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। আবুল হুসেনের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন *মোহাম্মদী, সুলতান* প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কিত বিরূপ উদ্ধৃতি সমূহ। ফলে ধর্মভীরু মুসলিম ভোটদাতাদের সমর্থন লাভে ব্যর্থ আবুল হুসেন জয়লাভ করতে পারেননি।"[১৬] আবুল হুসেন এ দেশের রাজনৈতিক অবস্থাকে একটি সুস্পষ্ট কর্ম-পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আদর্শগত কারণেই মুসলমান রাজনৈতিক নেতৃত্বদানকারীদের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য ঘটে।

কলকাতা হাইকোর্ট বারে যোগ দেওয়ার পরে আবুল হুসেন "১৯৩৪ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Tagore Law Lectures পদের জন্য The History of Development of Muslim Law in British India এ বিষয়ে পনেরোটি বক্তৃতার সার-সংক্ষেপ দাখিল করেন।"[১৭] বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃকপক্ষের নির্দেশে এ বিষয়ে সার-সংক্ষেপ পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে দ্বিতীয়বার দাখিল করেন। কিন্তু আবুল হুসেন এর সুফল ভোগ করে যেতে পারেননি। অতিরিক্ত পরিশ্রম আর

Dhaka University Institutional Repository

কর্মব্যস্ততায় তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। অতিরিক্ত খাটুনি এবং খাদ্য সংকোচনের ফলে শরীরে দ্রুত ভাঙ্গন দেখা দেয়। সৈয়দ আহমদ হোসেন বড় ভাই আবুল হুসেনের অসুস্থতার দিনগুলো সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে বলেন, "ব্যাধির সূচনা পেটের অসুখ। প্রথম দিকে হেকিমী চিকিৎসা করা হয়। বেশ কিছুদিন এই চিকিৎসা চলে। ---- পরে হেকিমী বাদ দিয়া কবিরাজী শুরু হয়। ---- এই চিকিৎসা দুই মাস চলে। কিন্তু সত্যিকার উপকার দেখা গেল না। এ সময় তাঁর চিকিৎসা করেন এলোপ্যাথ ডাঃ দুর্গারতন ধর, ---- ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ---- ডাঃ ডিনাম হোসাইট। ---- ব্যাধিটা পেটের নাড়ীতে সীমাবদ্ধ। ---- খাওয়া দাওয়া সীমিত ও সংক্ষিপ্ত হইতে শুরু করে। ---- এ সময়ে তাঁহার শরীরে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। কলকাতার মেডিকেল কলেজের ডাক্তার কর্নেল হজ্জ ---- এর অধীনে প্রায় এক মাস চিকিৎসা করা হয়। কোন রকম উন্নতি না হওয়ায় তাঁর পরামর্শে স্বাস্থ্যকর স্থান রাঁচীতে এবং রাঁচীর ডাক্তারের পরামর্শক্রমে মধুপুরে নিয়ে যাওয়া হয়।"[১৮]

মধুপুরে চিকিৎসারত দিনগুলো সম্পর্কে আবদুল মজিদের মন্তব্য এই, "মধুপুরে মাস তিনেক থাকার পর তাতে স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি না হওয়ায় শেষে তাঁকে সিমলায় নিয়ে যাওয়া হয়। সিমলায় মার্কিন মিশনারী স্যানাটোরিয়ামের ডাক্তারগণ নানাভাবে তাঁর রোগ পরীক্ষা করে তাঁর পাকস্থলীর অন্ত্রে দুরারোগ্য ক্যান্সার নির্ণয় করেন। তাঁদের ব্যবস্থাপত্রে তাঁর রোগের সাময়িক উপশম ঘটলে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। কলিকাতায় কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথ ডাঃ বেলগার্ড ছিলেন তাঁর সর্বশেষ চিকিৎসক। উক্ত চিকিৎসকের অধীনে আড়াই মাস কাল চিকিৎসা হওয়ার পর সহসা ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৩৮ সনে ১৫ই অক্টোবর শনিবার সকাল সাড়ে সাত ঘটিকায় সকল যন্ত্রণা ও ভাবনার যবনিকা টেনে ৪২ বছরেরও কম বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।" [১৯]

আবুল হুসেনের জীবদ্দশায় যাঁরা তাঁর চিন্তাধারাকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি তাঁরাও তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর প্রতিভা, মানসিকতা ও বাঙালি মুসলমান সমাজের কল্যাণকর বেশ কিছু দিকের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এক শোকবাণীতে 'প্রতিভাশালী ও শক্তিমান পুরুষ' শিরোনামে লেখেন, "মৌলভী আবুল হুসেন মরহুমের অকাল মৃত্যুতে যাহার পর নাই মর্মাহত হইয়াছি। মতামতের অল্প-বিস্তর পার্থক্য

Dhaka University Institutional Repository

থাকা সত্ত্বেও মরহুমকে আমি বরাবরই একজন প্রতিভাশালী ও শক্তিমান পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। কলকাতায় আসার পর তাঁহার সঙ্গে চিন্তার আদান-প্রদানেরও যথেষ্ট সুযোগ ঘটিয়াছিল। তখন আশা করিয়াছিলাম আবুল হুসেন অদূর ভবিষ্যতে মোছলেম বঙ্গের জীবন-সাধনার অন্ততঃ একটা দিকের অভাব সম্পূর্ণভাবে পূরণ করিয়া দিবেন। চরম পরিতাপের বিষয়, সে আশা অসময়ে নির্মূল হইয়া গেল, একটা বিপুল সম্ভাবনাকে বাংলার মুসলমান চিরদিনের জন্য হারাইয়া বসিল।"[২০]

আবদুল মজিদের লেখা থেকে জানা যায়, সেদিন অনেকেই পার্ক-সাকার্স এভিনিউ-র বাড়িতে আবুল হুসেনের বাসায় সমবেদনা জানাতে আসেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন, "শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, খাঁন বাহাদুর আবদুল মোমিন, খাঁন বাহাদুর মাওলা বক্‌শ, খাঁন বাহাদুর তসদ্দুক আহম্মদ, খাঁন সাহেব আনোয়ারুল কাদীর, খাজা নাজিমুদ্দিন, খাজা শাহাবুদ্দীন, এডভোকেট আবুল কাসেম প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।"[২১] আবুল হুসেনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে আবদুল কাদির (কবি) *রবী* পত্রিকা সম্পাদক কবি ওহীদুল আলমকে একটি পত্রে লেখেন,–"কলকাতায় আবুল হুসেনের বহু বিশিষ্ট বন্ধু ছিল, কিন্তু আমার প্রতি তিনি এত স্নেহপরায়ণ ছিলেন যে, আমাকে অত্যন্ত দরিদ্র জেনেও আমার বাসা ছাড়া পারত পক্ষে অন্যত্র উঠতেন না। ---- প্রায়ই বল্‌তেন, 'দেখো কাদির, বড়লোক বন্ধুদের সহ্য করা যায় না—কী আত্মপরায়ণ আর দায়িত্বহীন, উচ্চ qualification সত্ত্বেও cultural level কত নিম্নে'। ---- Master of Low উপাধি ঘোষণার দিন সন্ধ্যায় আমার বাসায় (আবদুল কাদির) ফিরে ঈষৎ হেসে বললেন, 'দুটো পদক উপহার পেয়েছি দেখো'। ---- সেই সাফল্যের হাসি আজও আমার স্মৃতিতে অম্লান।"[২২]

আবুল হুসেন শুধু তৎকালীন সময়ে ব্যতিক্রম ছিলেন না, বর্তমান কালের বিচারেও তিনি বিরল দৃষ্টান্ত। সত্য কথা বলার সাহসিকতায় এই বিবেকবান, যুক্তিবাদী, আদর্শ চিন্তাবিদ দীর্ঘদিন বাঙালির আদর্শ হয়ে বেঁচে থাকবেন। তাঁর আদর্শবাদ ও সমাজ মনস্কতার স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে আবুল হুসেনের লেখা থেকে। তিনি লেখেন, "একদিন আমার কোন বন্ধু বলছিলেন, 'মুসলমান সমাজের বর্তমান অবস্থা দেখে মুসলমান বলে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করি। তার উত্তরে আমি বলেছিলাম, 'ঠিক ঐ জন্যই আমি মুসলমান বলে

Dhaka University Institutional Repository

পরিচয় দিতে দ্বিধাবোধ করি না। 'মুসলমানের ইতিহাসে আমি গর্ব অনুভব করি না। আমি তার বর্তমান দুর্গতির জন্য আমার সৌভাগ্য বোধ করি, তার কারণ, এই দুঃস্থ সমাজে জন্ম গ্রহণ করে মানুষকে নানা প্রকারে সেবা করবার প্রচুর সুযোগ লাভ করতে পারব। জগতের মহাপুরুষগণ চিরদিনই দুঃস্থ অধঃপতিত জাতির মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁদের জীবনস্মৃতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক।"[২৩] আবুল হুসেন সম্পর্কে কাজী মোতাহার হোসেন, যথার্থই বলেছেন,- "তিনি সত্যি সত্যিই মুখপোড়া, উচিত কথাটি শুনিয়ে দিতে কাউকে খাতির করতেন না। আবুল হুসেনের আসল কর্তৃকপক্ষ ছিল তাঁর বিবেক।"[২৪] এটাই ছিল আবুল হুসেনের জীবন-দর্শন আর দৃষ্টিভঙ্গি।

আবুল হুসেনের জীবন আলোচনার উপসংহারে আমরা একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে সমসাময়িক কালে কায়েমী স্বার্থবাদীদের দ্বারা তিনি অবহেলিত, লাঞ্ছিত, ধিকৃত হলেও বর্তমানের বিচারে আবুল হুসেন এক আদর্শ মনীষী। আমরা আরও বলতে পারি যে বাঙালি মুসলমান সমাজের এক বিশেষ মুহূর্তে জন্ম গ্রহণ করে যে কথাগুলো তিনি বলেছিলেন আবুল হুসেন মৃত্যুর ৬০ বছর পরেও তাঁর সেই বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা কমেনি।

তথ্য নির্দেশ

১। মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, *জীবনী গ্রন্থমালা*-১৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, আবুল হুসেন অংশ, পৃ.১০

২। ঐ, পৃ.১২

৩। খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ: সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৩৯৩

৪। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ.২৭৮-২৮০

৫। মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১১

৬। ঐ . পৃ. ১৩

৭। ঐ, পৃ.১৫

৮। ঐ, পৃ.১২

Dhaka University Institutional Repository

৯। ঐ, পৃ. ১৫

১০। ঐ, পৃ.১২

১১। সরদার আবদুস সাত্তার, 'চিন্তা নায়ক আবুল হুসেন: ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও উত্তরকাল' আবুল কাসেম ফজলুল হক সম্পাদিত, *লোকায়ত*, ষোড়শ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১২

১২। মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩ - ১৪

১৩। আবদুল কাদির সম্পাদিত, ১ম খণ্ড পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯১

১৪। মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৭

১৫। আবদুল কাদির সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৯০

১৬। মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৮

১৭। আবদুল কাদির সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

১৮। মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৭

১৯। ঐ, পৃ.৩৭

২০। আবদুর কাদির সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৭৯

২১। মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮

২২। আবদুল কাদির সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৯১

২৩। মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৪

২৪। সরদার আবদুস সাত্তার, পূর্বোক্ত, পৃ.১২

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংগঠনিক কার্যক্রম : 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন

সংগঠক হিসেবে আবুল হুসেনের আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর স্কুল জীবন থেকেই। যখন তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র তখনই তিনি যশোহর-খুলনা সিদ্দিকিয়া সাহিত্য সমিতির কলকাতা কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন (১৯১৪ সন)। এ দায়িত্ব তিনি ১৯২০ সন পর্যন্ত অর্থাৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকাল পর্যন্ত পালন করেছেন। এ সময়ে তিনি নিজের হাতে লেখা মাসিক *মলয়া* পত্রিকার কলকাতা শাখার সম্পাদক (১৯১৪-১৯২০ সন পর্যন্ত) ছিলেন।[১] পত্রিকাটি তাঁর সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হতো। অনেকের মতে, এখানেই আবুল হুসেনের সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনার হাতে-খড়ি।

স্বল্পায়ু আবুল হুসেনের জীবনে কর্মের পরিধি সমসাময়িক কারও চাইতে কোন অংশে কম ছিল না। ১৯২১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার পাশাপাশি পত্রিকা সম্পাদনা, সমাজ সংগঠনমূলক কাজে তাঁর সক্রিয় অংশ গ্রহণ তখনকার সমাজ-ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল। সরদার আবদুস সাত্তারের মতে, *তরুণপত্র* (মাসিক, ১৯২৫), *শিখা* (বার্ষিক, ১৯২৬), *জাগরণ* (মাসিক, ১৯২৮) এই তিনটি সাময়িক ও বার্ষিক পত্রিকার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে আবুল হুসেনের নাম জড়িয়ে রয়েছে। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (১৯২৬) ও 'আল মামুন ক্লাব' (১৯২৭)-এর তিনিই ছিলেন কর্ণধার।[২]

আবুল হুসেন এ সময়ে (১৯২১-১৯২৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় কর্মরত ছিলেন। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর মুখপত্র *শিখা* পত্রিকায় প্রকাশিত 'শিখা গোষ্ঠী'-র লেখকদের রচনা তৎকালীন সময়ে রক্ষণশীল মুসলমান সমাজের দারুণ অসন্তোষের কারণ হয়েছিল। অবশ্য এর আগেও বাঙালি মুসলমান কর্তৃক বাংলা ভাষায় বেশ কিছু সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। বলা যায় উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে সমাজ-হিতৈষণার ক্ষেত্রে সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র-সমূহ গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রচার মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের এই সময় থেকেই পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজের উন্নতি সাধনের জন্য বেশ কিছু সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও পত্র - পত্রিকা গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি (১৮৬৩), ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন (১৮৭৭), সমাজ সম্মেলনী (১৮৭৯), ইসলাম প্রচারক (১৮৯১), মহামেডান লিটারেরি একাডেমি (১৮৯৩), সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি (১৯০০), সোলতান (১৯০১), মোহাম্মদী (১৯০৩), প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি (১৯০৬), বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি (১৯১১), সওগাত (১৯১৮), মুসলিম সাহিত্য সমাজ (১৯২৬), শিখা (১৯২৭) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তৎকালীন সময়ে সমাজ-সংস্কারমূলক কাজে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি মুসলমানদের আগ্রহ সৃষ্টিতে এই প্রতিষ্ঠানগুলো অত্যন্ত মূল্যবান ভূমিকা রেখেছিল। বাংলার মুসলমানদের জাগরণের ইতিহাসেও এই প্রতিষ্ঠানগুলোর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

এসময়ে মুসলমানদের দ্বারা যে সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতো এগুলোর বেশির ভাগই ছিল কলকাতা শহর কেন্দ্রিক। এদের মধ্যে আঞ্জুমানে ইসলামী (১৮৫৫, কলকাতা) মুসলমানদের প্রথম সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সকল শ্রেণীর মুসলমানের স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধন করাই ছিল এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের মূল লক্ষ্য।

এখানে একটি বিষয় স্মর্তব্য যে, উপরে উল্লিখিত পত্র-পত্রিকাসমূহের আয়ুষ্কাল দীর্ঘ ছিল না এবং সেগুলো সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখতে পারেনি। এ সময়ে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর অধিকাংশই ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হতো। তার কারণ এই পত্রিকার মালিক বা সম্পাদকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন মাওলানা। ইসলামের বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী মাওলানাগণ তাঁদের নিজ নিজ মতবাদ প্রচারের মাধ্যম হিসেবে এই সংবাদপত্রকে ব্যবহার করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে *সওগাত* সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন লেখেন, "তৎকালের বাংলার মুসলমান সমাজে যেসব পত্র-পত্রিকা চালু ছিল তার অধিকাংশই ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বের হত। ---- নানা রকম বিধি-নিষেধের মধ্যে লেখকরা আবদ্ধ ছিলেন। ---- আর সেই অন্ধকার যুগে স্বাধীন চিন্তা বা স্বাধীন মতবাদ প্রচার ছিল বিপদজনক।"[৩]

Dhaka University Institutional Repository

এ মতবাদের বাইরেও যে দু-একটি পত্রিকা সমাজ-সংস্কার ও চিন্তার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা রেখেছিল 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এদের অন্যতম। এর আগে মুসলমান সমাজের আভ্যন্তরীণ গলদগুলোর উন্মোচন বা নিরসন এবং সমাজ পুনর্গঠনের কথা অন্য কোন সাহিত্য পত্রিকা তেমন জোরের সাথে বলেনি। ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর মুখপত্র *শিখা* পত্রিকার দায়িত্ব ছিল এ বিষয়ে অদ্বিতীয় এবং বলা যায় সবচেয়ে কার্যকর।

তৎকালে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র সাথে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তবুদ্ধিচর্চায় আগ্রহী প্রতিভাবান ছাত্র ও শিক্ষকরাও জড়িত ছিলেন। পেশায় স্বাধীন এবং জ্ঞানচর্চায় প্রাগ্রসর এই ছাত্র-শিক্ষকগণ অন্যকে অনুকরণ বা অনুসরণ করেননি বরং তাঁরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে নতুন সৃষ্টিকর্মে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছিলেন। সে সময়ে তাঁরা সকলেই তাঁদের সংগঠনের বাৎসরিক মুখপত্র *শিখা*'র নামানুসারে 'শিখা গোষ্ঠী'র লেখক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। 'শিখা গোষ্ঠী' শব্দটিকে তৎকালীন বিরুদ্ধবাদীরা বিদ্রূপার্থেও ব্যবহার করতেন। এ গোষ্ঠীর সাথে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাঁরা হলেন—কাজী আনোয়ারুল কাদীর (১৮৮৭-১৯৪৮), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), আবুল হুসেন (১৮৯৭-১৯৩৮) কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), মোতাহার হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯) ও শামসুল হুদা (১৯১০-১৯৯৩?)।[৪] অথচ এঁদের মধ্যে আবুল হুসেন-ই ছিলেন সাহিত্য সমাজ ও *শিখা* পত্রিকার পুরোধা প্রাণ পুরুষ। আবুল ফজল তাঁর *সাহিত্য সংস্কৃতি* ও *সাধনা* গ্রন্থে "কাজী আবদুল ওদুদকে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের 'ভাবযোগী' ও আবুল হুসেনকে 'কর্মযোগী' বলে অভিহিত করেন।"[৫] অর্থাৎ আবুল হুসেন সংগঠক ও সমাজ-সংস্কারক হিসেবে সে সময়ে যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন আবুল ফজলের উক্তিটি তার যথার্থ প্রমাণ। আবুল হুসেনের এই মুখ্য ভূমিকার কারণেই বিশ শতকের গোড়ার দিকে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মর্মবাণী ও ভাবধারা এবং 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।[৬]

'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' গঠনের ইতিহাস হলো, ১৯২৬ সালের ২৫শে জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলে একটি বৈঠকের মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠা সভার সভাপতি ছিলেন দেশের প্রথিতযশা স্বনামধন্য জ্ঞানতাপস অধ্যাপক ড. মুহম্মদ

Dhaka University Institutional Repository

শহীদুল্লাহ্ এবং পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আবুল হুসেন নিজে। সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক এই প্রতিষ্ঠানের মূলমন্ত্র ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি'। অন্ধবিশ্বাসের বন্ধন থেকে তাঁরা বুদ্ধিকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কাজী আবদুল ওদুদ এই সামাজিক সংগঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখেন, বিচার-বুদ্ধিকে অন্ধ সংস্কার ও শাস্ত্রানুগত্য থেকে মুক্তিদান—বাংলার মুসলমান সমাজের (হয়ত বা ভারতের মুসলমান সমাজে) এ ছিল এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। কিন্তু সেদিন বিস্ময়কর হয়েছিল বাংলার শিক্ষিত মুসলিম তরুণদের উপর এর প্রভাব। ---- দৃশ্যত এর প্রেরণা এসেছিল মোস্তফা কামাল (১৮৮৫-১৯৩৮), রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) প্রমুখ মনীষীর উদ্যম থেকে।[৬]

এ কথা সুবিদিত যে, সাময়িকপত্রের আশ্রয়ে এই সময়ের বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিশেষ বিকাশ ও পরিপুষ্টি ঘটে। একটি সমাজের সামাজিক, বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার পরিচয় পাওয়া যায়—সে সময়ের সাময়িকপত্রে। আল্ মামুন, ইব্নে-রুশদ, ইব্নে খলদুন প্রমুখ মধ্যযুগের বরণ্যে মনীষীদের বুদ্ধিচর্চা ও সমাজচিন্তার ধারা লক্ষ্য করে আধুনিক কালের চিন্তার স্রোতকে সম্মুখে রেখে আবুল হুসেনের প্রযত্নে ১৯২৫ (১৩৩২, ২ জ্যৈষ্ঠ) সালে ঢাকা থেকে মাসিক *তরুণপত্র* প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে 'তরুণের কথা' শিরোনামে-এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করে আবদুল কাদির লেখেন, "বাংলার তরুণ সম্প্রদায়ের হিতার্থে সৃষ্ট *তরুণপত্র* প্রকাশিত হইল। *তরুণপত্রের* উদ্দেশ্য বাংলার হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান-ভেদে তরুণ-সমাজের কল্যাণ বিধান। ---- মানুষের যথার্থ কল্যাণ হয় জ্ঞানে। কেহ কেহ বলিবেন ধর্মে, কিন্তু জ্ঞানহীন ধর্ম অর্থবিহীন। সুতরাং বলিব, মানুষের মুক্তি হয় জ্ঞানে। এই জ্ঞান প্রচারের সংকল্পেই *তরুণপত্রের* সৃষ্টি। ---- '*তরুণপত্রের* আরও উদ্দেশ্য, বাংলার তরুণ সম্প্রদায়কে সমাজ ও দেশহিতকর ব্রতে উদ্বোধিত করা।"[৭]

তরুণপত্রের প্রথম সংখ্যা থেকে চতুর্থ সংখ্যা পর্যন্ত পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে মুহম্মদ ফজলুল করিম মল্লিক ও আহমদ হোসেন বি. এ. এবং পঞ্চম সংখ্যায় (ভাদ্র, ১৩৩২) সহ-সম্পাদক আবুল ফজলের নাম ছাপা হয়। প্রকৃত পক্ষে এ পত্রিকাটি পরিচালনা ও প্রকাশনার সমস্ত দায়-দায়িত্ব ও অর্থ যোগান দিতেন আবুল হুসেন, নিজের নামে, ছদ্মনামে,

Dhaka University Institutional Repository

কখনও অন্যের নামে (আবুল ফজলের নামে)। *তরুণপত্রের* বেশির ভাগ লেখা আবুল হুসেন লেখেন এবং 'পাথেয়' শিরোনামে প্রত্যেক সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে একটি করে প্রবন্ধ লিখতেন। *তরুণপত্রের* নাম ব্লকের পাশে ছাপা হতো, "উড়াও তরুণ জয়-পতাকা পাহাড়-সাগর ভেদ করি, এর নিচে একটু বড় অক্ষরে মুখবাণী (Motto) হিসেবে লেখা থাকত —

"যদি সত্যের থাকে বল
তবে নির্ভয় চিতে চল।"[৮]

সমসাময়িক কালের সমালোচকদের মতে *তরুণপত্রের* নাম ব্লক ও মুখবাণীটি ছিল আবুল হুসেনের লেখা।

প্রমথ চৌধুরী *তরুণপত্রের* প্রথম তিনটি সংখ্যা পড়ে তাঁর সম্পাদিত *সবুজপত্র* (১৩৩২), অগ্রহায়ণ সংখ্যায় *তরুণপত্র* শীর্ষক এক দীর্ঘ প্রবন্ধে *তরুণপত্র* কে অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন, "*তরুণপত্র* পড়ে আমি শুধু সুখী হইনি, সেই সঙ্গে বিস্মিতও হয়েছি। ---- চিন্তাশক্তিকে বাড়াবার একটা প্রধান উপায় হচ্ছে বিচার। সুতরাং *তরুণপত্রের* এই অধ্যবসায় দেখে আশায় আমার বুক ভরে উঠেছে। ---- মানুষের চোখ ফোটাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাকে চিন্তারাজ্যে নিয়ে যাওয়া। সে রাজ্যে জাতিভেদ নেই। বাংলার তরুণের দল যে হিন্দু-মুসলমান নির্বিচারে এই রাজ্যে প্রবেশ করতে উন্মুখ হয়েছেন—এর চাইতে আনন্দের কথা আর কি হতে পারে ? *তরুণপত্র* যদি নতুন করে ভাবতে পারে, তাহলে সে ভাব সে কথায় বলতে পারে। তার সহজ সরল ভাষা পড়ে আমি একটু অবাক হয়ে গিয়েছি। এই ভাষাই পরিচয় দেয় যে মুসলমান-হিন্দুর কত কাছে এগিয়ে এসেছে—আর ঢাকা, কলকাতার *সবুজপত্র তরুণপত্রকে* ডেকে বলছে, 'ভাই, হাত মিলা না।"[৯] *সবুজপত্র* এবং *তরুণপত্র* নামের অর্থের মিল এবং *সবুজপত্র* ও *তরুণপত্রের* মধ্যে কিছুটা নবতর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেয়েই হয়ত প্রমথ চৌধুরী এই উক্তিটি করেছিলেন। *তরুণপত্র* দীর্ঘায়ু হয়নি। আবুল ফজলের লেখা থেকে জানা যায়, *তরুণপত্রের* চতুর্থ সংখ্যায় (১৩৩২, শ্রাবণ) আবুল ফজলের 'মাতৃভাষা ও বাঙালি মুসলমান' নামে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। ---- *তরুণপত্রে*'র একই সংখ্যায় লা-পরওয়া ছদ্মনামে আবুল হুসেনের বাংলার—বলশীর একটি আলোচনা লিখেছিলেন আবুল ফজল। ---- এরপর থেকে *তরুণপত্রের* কভারে সম্পাদক ফজলুল করিম মল্লিক

Dhaka University Institutional Repository

এবং সহ-সম্পাদক হিসেবে আমার নাম ছাপা হয়। খুব সম্ভব এর পর দু-এক সংখ্যার বেশী *তরুণপত্র* আর বের হয়নি।"[১০] সহ-সম্পাদক হিসেবে আবুল ফজলের নাম ছাপার পর আবুল হুসেন পত্রিকার ব্যয়ভার বহন ছেড়ে দেন। ফলে ফজলুল করিম মল্লিকের পক্ষে পরবর্তীতে *তরুণপত্র* প্রকাশ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। *তরুণপত্র* বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মুসলিম তরুণদের মধ্যে মুক্তচিন্তা ও যুক্তিবিদ্যার যে বীজ *তরুণপত্রে* আবুল হুসেন বপন করেছেন তার যাত্রা থেমে যায়নি। এরই উৎস থেকে "১৯২৬ সালের ১৯শে জানুয়ারিতে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' তথা বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন। এরই মুখপত্র হিসেবে মাসিক *অভিযান* (১৩৩৩, ভাদ্র) ও বার্ষিক *শিখা* (১৩৩৩, চৈত্র) পত্রিকা দু'টি প্রকাশিত হয়।"[১১]

অভিযান (মাসিক) পত্রিকাটির নাম ও প্রকাশনার সাথে কাজী নজরুল ইসলাম বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন বলে জানা যায়। *অভিযান* এর শিরোনাম প্রসঙ্গে খোন্দকার সিরাজুল হক তাঁর *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ: সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম* গ্রন্থে লেখেন, "১৯২৬ সালে জুন মাসে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর বন্ধু অধ্যাপক হেমন্তকুমার সরকারকে সঙ্গে নিয়ে প্রথম ঢাকায় আসেন। ---- কাজী নজরুল ইসলামের ঢাকায় আগমনের কয়েক দিনের মধ্যে ২৭শে জুন, ১৯২৭ সালে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর চতুর্থ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ---- মোহাম্মদ কাসেম এ সময়ে একটি পত্রিকা প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে কাজী নজরুল ইসলাম পত্রিকাটির নাম দেন *অভিযান*।"[১২] এর মাত্র দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যার 'সারথি পাজি' শিরোনামে সম্পাদকীয়টি আবুল হুসেনের লেখা। *অভিযান* এর নাম-পত্রে কাজী নজরুল ইসলাম *অভিযান* নামে একটি কবিতা লেখেন। প্রথম সংখ্যায় (১৩৩৩, ভাদ্র) কাজী আবদুল ওদুদের 'সম্মোহিত মুসলমান' এবং আবুল হুসেনের 'নিষেধের বিড়ম্বনা' বিখ্যাত প্রবন্ধ দুটি প্রকাশিত হলে রক্ষণশীল মুসলমান সমাজে প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। *অভিযান* এর দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৩৩৩, আশ্বিন) আবুল হুসেনের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রচনা 'শতকরা পয়তাল্লিশের জের' ছাপা হলে বিরুদ্ধবাদীদের তীব্র সমালোচনার মুখে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।[১৩]

'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক বছর পর সাহিত্য সমাজের প্রথম বছরের অধিবেশনের কার্যবিবরণী নিয়ে ৮ই এপ্রিল ১৯২৭ সালে (১৩৩৩, চৈত্র) বার্ষিক

Dhaka University Institutional Repository

শিখা প্রকাশিত হয়। খোন্দকার সিরাজুল হক তাঁর *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ: সমাজচিন্তা ও সমাজকর্ম* গ্রন্থে *শিখার* প্রকাশকাল ও সম্পাদকের একটি তালিকা প্রণয়ন করেন এভাবে*—

সংখ্যা	প্রকাশকাল	সম্পাদকের নাম	প্রকাশক	মূল্য
প্রথম সংখ্যা	১৯২৭ খ্রীঃ / ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ	আবুল হুসেন	আব্দুল কাদির	আট আনা
দ্বিতীয় সংখ্যা	১৯২৮ খ্রীঃ / ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ	কাজী মোতাহার হোসেন	সৈয়দ ইমামুল হোসেন	আট আনা
তৃতীয় সংখ্যা	১৯২৯ খ্রীঃ / ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ	কাজী মোতাহার হোসেন	সৈয়দ ইমামুল হোসেন	এক টাকা
চতুর্থ সংখ্যা	১৯৩০ খ্রীঃ / ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ	মোহাম্মদ আবদুর রশিদ	সৈয়দ ইমামুল হোসেন	আট আনা
পঞ্চম সংখ্যা	১৯৩১ খ্রীঃ / ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ	আবুল ফজল	সৈয়দ ইমামুল হোসেন	চার আনা

১৯২৭ সন থেকে ১৯৩১ সন পর্যন্ত এ পাঁচ বছরে *শিখার* পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 'সাহিত্য সমাজে'র লেখকদের প্রদত্ত তথ্য ও উপরের ছক অনুযায়ী শুধু প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক হিসেবে আবুল হুসেনের নাম পাওয়া যায়।

'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র প্রথম অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনের (২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭ সন) আলোচনায় কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর ভাষণে যে কথাগুলো বলেন, তা হুবহু এ রকম,—"আজ আমি এই মজলিসে আমার আনন্দবার্তা ঘোষণা করছি। বহুকাল পরে কাল রাতে আমার ঘুম হয়েছে। আজ আমি দেখছি এখানে মুসলমানের নতুন অভিযান শুরু হয়েছে। আমি এই বার্তা চতুর্দিকে ঘোষণা করে বেড়াব। এতদিন মনে করতাম, আমি একাই কাফের, কিন্তু আজ দেখে আমি আশ্বস্ত হলাম যে, মৌলানা আনোয়ারুল কাদীর প্রমুখ কতগুলি ব্যক্তি দেখছি আস্ত কাফের। আমার দল বড় হয়েছে, এর চেয়ে বড় সান্ত্বনা আর আমি চাই না।"[১৪]

---

* খোন্দকার সিরাজুল হক, মুসলিম সাহিত্য-সামাজ: সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম, পৃ. ১৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

'মুসলিম সাহিত্য সামজে'র এ অভিযানকে হিন্দু-মুসলমান অনেক বুদ্ধিজীবিই সেদিন সমর্থন জানিয়েছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অভিমত, "আজ দেশের মধ্যে মুক্তির ডাক এসেছে। কিন্তু সে ডাক অতি ক্ষীণ। দূরের বাঁশীর সুরের মতো কখন সে কানে এসে লাগে কি লাগে না। ভীরু কাপুরুষ আমরা, তার উপর তন্দ্রা ঘোরে বিভোর । চাই আমাদের জন্য তুরী ভৈরীর তীক্‌খিন বিকট নিখাদ নাদ। তা না হলে জীবনের রাঙ্গা পতাকার নীচে দলে দলে মুক্তি-ফৌজ এসে জম্‌বে না; তা না হলে মুক্তির লড়াই আমাদের চল্‌বে না; তা না হলে মুক্তি আমাদের মিল্‌বে না। তাই চাই আমাদের বীর্যবন্ত সাহিত্য।"[১৫] কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণশীলদের প্রচণ্ড চাপে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের গতি বেশি দূর এগুতে পারেনি। প্রথম অধিবেশনেই সভাপতি তাঁর আলোচনার শেষে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। খান বাহাদুর তসদ্দুক আহমদ তাঁর সমাপনী ভাষণে যে কথাগুলো বলেন—তাহলো "আজ দুই দিন ধরে আমরা বস্তা বস্তা ময়লা কাপড় ধুয়েছি। মাঝে মাঝে এরূপ করে ময়লা না পরিষ্কার করলে সমাজের মন রুদ্ধ হয়ে যায়। ---- আজ আমরা যে ভাঙতে চেয়েছি – বিদ্রোহী হয়ে ভাঙতে চাচ্ছি, সেটা শুভ লক্ষণ মনে করতে হবে। আমাদের মনে ঐ ময়লা আবর্জনা দূর করার স্পৃহা জেগেছে। কিন্তু বন্ধুগণ, শুধু ভাঙলে চলবে না, গড়তেও হবে। আমাদের আজ সৃষ্টি করতে হবে নব নব উদ্ভাবনা জাগুক ও নব নব চেষ্টা আমাদের হোক আজ আপনারা প্রতিশ্রুত হয়ে গৃহে ফিরে যান যে, আমরা সৃষ্টি করব।"[১৬] এই নব নব সৃষ্টিই ছিল সাহিত্য সমাজের সাহিত্যচর্চার মূল উদ্দেশ্য।

১৯২৯ সালে আবুল হুসেনের 'আদেশের নিগ্রহ' প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে মুসলমান সমাজে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে তিনি অনেকটা নীরবেই সাহিত্য সমাজের প্রত্যক্ষ কর্ণধারত্ব থেকে সরে দাঁড়ান সত্য; কিন্তু ১৯৩২ সনে কলকাতা হাইকোর্টে যোগদান করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র এবং *শিখার* নেপথ্য পরিচালক ও সম্পাদক। আবুল ফজল তাঁর আত্মজীবনীমূলকগ্রন্থ *রেখাচিত্রে* উল্লেখ করেন, "*শিখার* পৃষ্ঠায় সম্পাদক হিসেবে যাঁরই নাম থাক্ আসলে পেছনে থেকে সব কাজ করতেন কর্মবীর আবুল হুসেন। ---- সাহিত্য সমাজ আর *শিখার* পেছনে অর্থ এবং শ্রম দু-ই জোগাতেন আবুল হুসেন সাহেব—নীরবে আর আমাদের অজ্ঞাতে। দেনার দায়ও তাঁর, মতামতের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

জবাবদিহিতা বা নিগ্রহ ভোগের বেলায়ও তিনি।"[১৭] 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনে (১৯৩২ সন) আবুল হুসেন মূল সভার সভাপতি এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। এ বছরই তিনি ঢাকা ত্যাগ করে কলকাতা চলে যান। এর পরে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র ৩/৪টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু *শিখা* পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। তবে *শিখার* যে পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলোতে সাহিত্য সমাজের বার্ষিক সভার কার্যবিবরণী ও সভায় পঠিত ভাষণ এবং সমাজের প্রগতিশীল লেখকদের রচিত শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। 'মুসলিম সাহিত্য সামাজে'র মুখপত্র *শিখার* মুখবাণী বা Motto রূপে শোভিত অবিস্মরণীয় বাণীটি শান্তি নিকেতনের সর্বজ্ঞান সাধনার স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমর উপদেশ 'জ্ঞানের রাজ্যে অসহযোগ (non-co-operation) মৃত্যু, এই বাণীটিকেই সম্প্রসারিত করে আবুল হুসেন রচনা করেন, 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।'[১৮] আবুল হুসেনের পরিকল্পনায় *শিখার* মলাটের ছবিটি নিয়েও কেউ কেউ ঘোর আপত্তি তুলেছিলেন, তাঁদের মতে, উক্ত ছবিটির তাৎপর্য হল, মসজিদ ও কোরান শরীফকে আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আবুল ফজল লেখেন, "*শিখার* টাইটেল পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র রেখাচিত্রটি, শুনেছি তাও এঁকেছিলেন আবুল হুসেন সাহেব। একটি খোলা কোরান শরীফ ---- মানব-বুদ্ধির আলোর স্পর্শে কোরানের বাণী প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে, এ ছিল রেখা চিত্রটির মর্ম। ---- বিরুদ্ধবাদীরা এর অর্থ রটালেন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র সমর্থকরা 'কোরানকে পুড়িয়ে ফেলে শুধু মানব বুদ্ধিকেই দাঁড় করাতে চাচ্ছে। বলা বাহুল্য গোড়া থেকেই গোঁড়ারা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র বিরোধী ছিল।"[১৯]

'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র মুক্ত বুদ্ধির আন্দোলন প্রতিষ্ঠায়, পৃষ্ঠপোষকতায় এবং পরিচালনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা শিক্ষকবৃন্দের একটি গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এ সম্পর্কে তথ্য বিশ্লেষণ করে তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মাহমুদ হোসেন লেখেন, "Dhaka University provided the young Muslims of East Bengal with the opportunity of intellectual regeneration. In the late twenties and early thirties this regeneration took the form of revolt against old traditions and complete modernization. It was in Dacca University that " **Muslim Sahitya Samaj** (Muslim Literary Society) was Formed with university teachers such as Abul Hussain (later on an M.L.A)

Dhaka University Institutional Repository

and Qazi Motahar Hossain as leading geniuses. This institution become the monitor of new Muslim consciousess."[২০] 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলের প্রভোস্ট ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক স্যার এ. এফ. রহমান। ইংরেজি বিভাগের ড. মাহমুদ হাসান, বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, আরবি বিভাগের ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন, অর্থনীতি বাণিজ্য বিষয়ে আবুল হুসেন ও মোহাম্মদ ইব্রাহিম প্রমুখ বিভিন্ন সময়ে সাহিত্য সমাজের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এর বাইরে *শিখার* সাময়িক অধিবেশন ও আলোচনায় যাঁরা যোগদান করেছেন তাঁদের নামের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়। তালিকাটি নিম্নরূপ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত নালিনীকান্ত ভট্টশালী, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মৌঃ আনোয়ারুল কাদীর, মৌঃ মোঃ আবদুর রশীদ, মৌঃ গোলাম মওলা, মৌঃ আমিনুল রসুল, মৌঃ আবদুল কাদের, মৌঃ আবদুস সালাম, মৌঃ আবদুস সালাম খাঁ ও আরো অনেকে। এঁরা সাহিত্য সমাজের বিভিন্ন সম্মেলনে ও অধিবেশনে যোগদান করেন।[২১] এতে দেখা যায় হিন্দু ও মুসলিম ভাবুকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করেন।

এ ছাড়াও আবুল হুসেন মাসিক *জাগরণ* (১৯২৮ সন, ১৩৩৫ বৈশাখ) নামে একটি সাময়িক পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। *জাগরণ* এর সম্পাদক হিসেবে মুন্সী আহমদ আলীর নাম প্রকাশিত হতো। কিন্তু এর প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী ছিলেন আবুল হুসেন। আবদুল কাদিরের 'তরুণ পত্র' প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, *জাগরণ* (মাসিক)-এর মোট সাতটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক সংখ্যাতেই ধ্বনিত হয়েছিল নবজাগরণের দুঃসাহসী মন্ত্র। জ্ঞান ও কল্যাণের ক্ষেত্রে আত্মার অনিমেষ জাগরণের এই মন্ত্র, আজ তার প্রয়োজন হয়েছে আরও বেশী।[২২] *জাগরণ* বন্ধ হওয়ার ফলে মুসলিম বাংলার তরুণদের অগ্রগতিতে কোলাহল অনেকটা থেমে যায়।

উপরে উল্লেখিত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, সংগঠক হিসেবে আবুল হুসেনের দক্ষতা ছিল অসাধারণ। তাঁর দক্ষ নেতৃত্বে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' সংগঠন-পরিচালন ও কয়েকটি সামাজিক ও বার্ষিক পত্র-পত্রিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জড়িত থাকা এর সত্যতা প্রমাণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১। মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, 'আবুল হুসেন' *জীবনী গ্রন্থমালা*-১৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ.২৮

২। মোরশেদ শফিউল হাসান, *আবুল হুসেন: নির্বাচিত প্রবন্ধ*, মাওলা বাদ্রার্স, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৮১-১৮২

৩। মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ.২৬-২৭

৪। খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ: সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১১২-১১৩

৫। আবুল ফজল, *সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা*, ইস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৬১, পৃ. ৪৪-৪৫

৬। *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ: সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪

৭। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ৪২০-৪২১

৮। ঐ, পৃ. ৪১৯

৯। *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ:সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, পূর্বোক্ত,পৃ.১৪৫-১৪৬

১০। আবুল ফজল, *রেখাচিত্র*, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৮৫, পৃ.১২৯-১৩০

১১। আবুল হুসেন রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ.৪২৬

১২। *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ: সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৪৬

১৩। *আবুল হুসেন নির্বাচিত প্রবন্ধ*, পূর্বোক্ত, পৃ.১২

১৪। *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ: সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৫৩

১৫। রশীদ আল্-ফারুকী সম্পাদিত, *বাঙালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্যচিন্তা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ.৮৫

১৬। *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ: সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৫৩

১৭। *রেখাচিত্র*, পূর্বোক্ত, পৃ.১২৮

১৮। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ.২৪

Dhaka University Institutional Repository

১৯। *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ: সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮-১৪৯

২০। মোঃ তৌফিকুল হায়দার, *মুসলিম মনীষী আবুল হুসেন ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন: ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ*, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণাকেন্দ্র, নিবন্ধমালা, ৭তম খণ্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন-১৯৯২, পৃ.৭৪

২১। *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, সম্পাদক আবুল আহসান চৌধুরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ.৯৯

২২। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৬

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ধর্ম-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কার বিষয়ক চিন্তা

বিশ শতকের প্রথমার্ধে, বিশেষ করে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে কতিপয় বাঙালি মুসলমান লেখকের রচনায় সমাজ ও ধর্মচিন্তায় উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমান সমাজকে কুসংস্কার এবং সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত করে একটি উদারনৈতিক পরিমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। শুধু আনুষ্ঠানিকতা ও সংস্কারাচ্ছন্নতার মধ্যে যাঁরা সমাজ ও ধর্মকে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন, তাঁদের মনে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানপ্রসূত সংস্কারমুক্ত যুক্তির আলো সঞ্চারিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন এই উদারনৈতিক লেখকেরা। মুক্তচিন্তা ও যুক্তি ছিল সমাজ-জীবনের বহু দূরে, মানবতা পরিপন্থী সমাজ-ব্যবস্থায় সঙ্কীর্ণতা, ধর্মের গোঁড়ামি পুরো সমাজ-ব্যবস্থাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

মুসলমান সমাজের এ অবস্থায় ইসলামের বিকাশশীল মূল সত্যকে তাঁরা আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছিলেন। ধর্মকে গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করে তার যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা এবং আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হওয়া তাঁদের আন্দোলনের মূলমন্ত্র ছিল। মুসলমান সমাজের এ অবস্থায় আবুল হুসেন (১৮৯৭-১৯৩৮) মুসলমান সমাজকে পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ায় অন্ধ সংস্কার ত্যাগ করে শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আহ্বান জানান। আবুল হুসেন 'অহমিকা' (১৩৩২) প্রবন্ধে লেখেন, "আমাদের অহমিকা আমাদের উন্নতির পথ রোধ করে রেখেছে। অহমিকা উন্নত-শির হলে তাঁর পূর্ণ প্রভাব দূরে সরে যায়। ---- নশ্বর ধনের জন্য তৃষিত ও ব্যগ্র হও, তার উপর আস্থা স্থাপন কর, তোমার অহমিকা প্রমত্ত হয়ে উঠবে ও তোমার বিনাশের পথ সহজ হবে। অহমিকা সর্বপ্রকারে তোমার পূর্ণ পথের কণ্টক—এ কথা ভুলো না। উপ-পদমর্যাদা ও পার্থিব সম্মান ও প্রশংসা আকাঙ্ক্ষা করা অহমিকা। শারীরিক সুখ অর্থাৎ রক্ত-মাংসের কামনা তৃপ্তির জন্য ব্যাকুল হওয়া অহমিকা। দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও জীবনকে সুপথে (সীরাতুল মুসতাক্বীম) পরিচালনা করতে অবহেলা করা অহমিকা। বর্তমান জীবনকে সার মনে করে পর জীবনকে তুচ্ছ করা

Dhaka University Institutional Repository

অহমিকা। ক্ষণস্থায়ী পদার্থে আসক্ত হওয়া ও অনিত্য সুখের সন্ধানে নিরত থাকা অহমিকা।"[১] আবুল হুসেন অহমিকাকে মুসলমান সমাজের অধঃপতনের মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। এই অহমিকা মুসলমান সমাজের উন্নতির পথ রোধ করে রেখেছে। তাঁর মতে, প্রকৃত মানুষ হতে হলে হযরত মুহম্মদের মহৎ জীবনাদর্শ অনুসরণ করতে হবে। অহমিকা মাথা তুলে দাঁড়ালে হযরতের পূর্ণ প্রভাব দূরে সরে যাবে। তিনি সঙ্কীর্ণ ধর্ম-চিন্তাকে কখনো প্রশ্রয় দেননি। আবুল হুসেন লোক দেখানো ভক্তি ও ধর্মপ্রীতিকে মানুষের বড় হওয়ার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে বলে মনে করতেন।

'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অধঃপতিত মুসলমান সমাজকে পুনর্গঠনের প্রয়াসে 'আমাদের কর্তব্য কি' (১৩৩৩) প্রবন্ধে আবুল হুসেন লেখেন, "আজ আমাদের সব ফেলে জ্ঞান-চর্চায় ধন-জন-প্রাণ বিসর্জন করতে হবে। সেই আদর্শ পুরুষের অন্তরের আদর্শকে জ্বল-জীবন্ত করে তুলতে হবে। আমরা জ্ঞানী হব, এই হবে আমাদের একমাত্র আদর্শ। শুধু জ্ঞান অর্জন কর, জ্ঞান চর্চা কর, মুসলমান ! তুমি আবার জয়যুক্ত হবে। বাঙলার পল্লীতে-পল্লীতে ঘুরে এই বার্তা শুনিয়ে দিতে হবে—আমরা কারো কৃপা চাই না, আমরা কোন ভিক্ষা চাই না, আমরা অর্থ চাই না, আমরা চাই জ্ঞান। মনে রাখতে হবে, পুরুষ প্রধান হযরত মুহম্মদের শিষ্যগণ তরমুজের খোসা ও শুক্‌নো খেজুর খেয়ে বিশ্ব-সভায় আসন লাভ করেছিলেন।"[২]

আবুল হুসেন মুলমানদের উদ্দেশে দুঃখ করে বলেন, বাংলার মুসলমান এখনো হযরত মুহম্মদ এর মহৎ জীবনের পরিচয় লাভ করেনি। তার জীবনের আদর্শ সম্যক উপলব্ধি করে সে আদর্শ অনুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালিত করা তাদের কর্তব্য। এ প্রবন্ধের অন্যত্র তিনি মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষাক্ষেত্রে অবস্থান চিহ্নিত করে লেখেন, "শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখি মুসলমান ছাত্র কত উদাসীন, আরাম-আয়েস প্রিয়, পরিশ্রম-বিমুখ, অসহিষ্ণু, আপাতঃ সুখকামী, জ্ঞানার্জন-কাতর, পরমুখাপেক্ষী, দায়িত্ব-জ্ঞানহীন, উদ্ধত, বিনয়হীন। ---- চেষ্টা করে সকলের চেয়ে ভালো হব, এ তাদের ধাতে এখনো আসেনি। ফলে তারা আজ জ্ঞান ও শিক্ষায় কত ছোট হয়ে রয়েছে।"[৩]

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হুসেনের শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি ছিলেন এর বিপরীত। বি.এল. ডিগ্রী অর্জন করার পরে আইন বিষয়ে আরও উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের জন্য আবুল হুসেন প্রথম ও দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েও তৃতীয়বারের জন্য পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন। 'সংকল্প সাধন কিংবা শরীর পতন' এই মন্ত্রে দীক্ষিত আবুল হুসেন তাঁর জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্তে অবিচল থাকার কারণে তিনি বহুবার তৎকালীন মুসলমান সমাজ কর্তৃক নিগৃহীত হয়েছিলেন।

'নিষেধের বিড়ম্বনা' (১৩৩৩) ও 'আদেশের নিগ্রহ' (১৩৩৬) আবুল হুসেনের বিখ্যাত দুটি প্রবন্ধ। রক্ষণশীলদের মতে প্রবন্ধ দুটিতে তিনি ইসলাম ধর্মের প্রচলিত নিয়মের সমালোচনা করেছেন যা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি, ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী কালচারে আঘাত করেছেন। মুসলমানদের ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা ও ইসলামী কালচার থেকে পৃথক বা বঞ্চিত করার উদ্দেশ্য আবুল হুসেনের ছিল না। তিনি উল্লিখিত প্রবন্ধে ইসলাম ধর্মের কালচারের ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। কিন্তু মুসলমান সমাজপতিরা যেভাবে এই কালচারের ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যা করছিলেন এবং জীবনকে তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন, আবুল হুসেন স্বজ্ঞানে তার বিরোধিতা করেছিলেন।

তৎকালীন মুসলমানদের সম্পর্কে আবুল হুসেন 'নিষেধের বিড়ম্বনা' প্রবন্ধে ক্ষুব্ধচিত্তে মন্তব্য করেন "মুসলমান আজ ঘোর পৌত্তলিক। সে খোদাকে চিনে না—সে চিনে তার পীর এবং তার দাদাপীরের কবর। কবর আজ মুসলমানের সর্বশ্রেষ্ঠ দরগা হয়েছে—তার সর্ব কামনার আখড়া সেখানে। দরগাকে শ্রদ্ধা করতে গিয়ে সে—মানুষকে শ্রদ্ধা করতে হয় কেমন করে তা ভুলে গেছে। সে দরগার পূজা করতে গিয়ে নিজের সেবায় উদাসীন হয়েছে এবং নিজেকে অন্যের শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলতে হয় কি করে সে—জ্ঞান হারিয়েছে। নিজে অবজ্ঞার পাত্র হলে যে ধর্মের অবমাননা আপনিই ঘটে, তা সে বুঝে না। নিজের অক্ষমতা দূর করার একমাত্র উপায় হয়েছে তার দরগায় মান্‌ত। তার দুরভিসন্ধি হাসিল করতে হলে, সে দৌড়ায় দরগায়; স্ত্রী—পুত্রের অসুখের জন্য ঔষধ ও পরিচর্যা ফেলে সে আনে দরগার মাটি কিংবা দরগার সেবকের তাম্বুল-তাম্বাকু-বিমিশ্র সুগন্ধি ফুৎকার। দরগায় মাথা ঠুকে সেলাম দিয়ে সে যায় জুয়াখেলায় ও ঘোড়দৌড়ে। খোদার নাম মুখে করে সে আরম্ভ করে মদ

Dhaka University Institutional Repository

খেতে—আল্লার নাম নিয়ে সে যায় পরের স্ত্রী অপহরণ করতে। খোদার নামের কি চমৎকার ব্যবহার। ---- আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হতে একথা গলা ছেড়ে বলবো যে, আজ মুসলমান নির্লজ্জ, কুরুচিপূর্ণ, ব্যভিচারী হয়ে পড়েছে। ----কি করে নিষেধের বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত হতে চায় ? নিষেধ তার নিকট মৃত্যু—নিষেধ তখন লঙ্ঘন করাই তার নিকট জীবন, সেইটাই তার নিকট অতি সত্য বলে প্রতীয়মান হয়।"[৪]

আবুল হুসেন মনে করতেন ধর্মের বিধি-নিষেধ থাকা সত্ত্বেও মুসলমান সমাজে ব্যভিচার, অনাচার চলছে। এই নিষেধগুলো এমনি বিড়ম্বনার সৃষ্টি করেছিল যে 'জন্তুধর্মী মানুষ' এগুলো চিরদিন মেনে চলেনি, চলতে পারেনি। মুসলমানদের মধ্যে পীরপূজা, দরগায় মান্‌ত, দরগা পূজা ইত্যাদি ইসলাম ধর্মসম্মত নয়, তথাপি মুসলমান সমাজে এগুলো লক্ষণীয় ছিল। স্ব-সমাজের এই নৈতিক অধঃপতন দেখে আবুল হুসেন মর্মাহত হয়েছিলেন। তাঁর ধারণা, এসবের ফলে ধর্মের মানব হিতৈষণা এবং প্রগতিমুখীনতা সেখানে নানা কুসংস্কারের আবর্তে ঘুরপাক খেয়েছে, কল্যাণমুখী পদক্ষেপ স্থবির হতে বাধ্য হয়েছে। আবুল হুসেন তাঁর প্রজ্ঞা ও অধীত বিদ্যা দ্বারা তা অভ্রান্তভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন।

হানাফী ও মোহাম্মদী মতাবলম্বীদের ধর্মমতের সামান্য পার্থক্যের কারণে তাদের মধ্যে যে হানাহানি ও বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রতিও তিনি আলোকপাত করেছেন। উভয়ের মধ্যে মতের পার্থক্য আচার বা হাদিসে বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে। বিরোধের সূত্র নিতান্ত গৌণ, কিন্তু বিরোধ প্রচণ্ড। একে আবুল হুসেন ধর্মের জুলুম বলেছেন। অন্যের মতের প্রতি অসহিষ্ণুতাই এ জুলুমের ভিত্তি বলে তিনি মনে করতেন। আবুল হুসেন এ প্রসঙ্গে বলেন, "যে সত্যকার ধর্মজীবন মানুষের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা বাড়ায়, সহানুভূতি ও বেদনা জাগায়—তাহা বিকৃত হয়ে গেছে; তার পরিবর্তে ধর্মজীবনের ভান ও তার বাড়াবাড়ি প্রবল হয়ে আমাদের চিত্ত-প্রকাশের স্বাস্থ্যকর পথগুলি সমস্ত একে একে রুদ্ধ করে ফেলেছে। আমাদের নিকট অন্তঃসারশূন্য নির্মম আচার-অনুষ্ঠানগুলির দৌরাত্ম্যই একমাত্র ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দৌরাত্ম্য দেহ ও মন উভয়কেই নিষ্পেষিত করে ফেলছে। সেই দেহ ও মনে জন্তুধর্মীর প্রভাবই বেশী হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু প্রতিবেশীর প্রতি সুব্যবহার করবার ব্যবস্থা করে সমাজধর্মী। আজ মুসলমান সমাজে জন্তুধর্মীরই প্রভাব যখন বেশী, তখন হিন্দু প্রতিবেশীর

Dhaka University Institutional Repository

সহিত যে দ্বন্দ্ব, তার সমাধান সন্তোষজনক হতে পারে না—যতদিন মুসলমানের মধ্যে সমাজধর্মী প্রবল হয়ে না উঠে। তার জন্য চাই, আমাদের চোখে যে ১ হাজার বৎসরের পুরাতন ধর্মের ঠুলি লাগান আছে, সেটা খুলে ফেলে, খোদার দেওয়া চক্ষু দিয়ে সমস্ত দুনিয়াটাকে একবার ভালো করে দেখা।"[৫] আবুল হুসেন মুসলমান সমাজকে ধর্মের অন্তঃসার-শূন্য আচার অনুষ্ঠানগুলো পরিহার করে প্রকৃত জ্ঞান ও রুচির বৈচিত্র্য অর্জনের মাধ্যমে ইসলামের মূল সত্য উপলব্ধি করার পরামর্শ দিয়েছেন।

ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ বলে মাওলানাগণ যে ফতোয়া জারি করে থাকেন, তা থেকে দরিদ্র মুসলমানদের মুক্তির বা কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা তারা দিতে পারেননি বলে আবুল হুসেন মনে করেন। এ প্রবন্ধে তিনি এ পরিস্থিতির সমালোচনা করে তা থেকে মুক্তির পরামর্শ স্বরূপ বলেন, "হযরত বেদুইনকে ইহুদী জোঁকগুলির হাত হতে রক্ষা করবার জন্য 'সুদে'র ফতোয়া জারি করেছিলেন। আজ মুসলমানকে মহাজন-জোঁকের হাত হতে রক্ষা করবার জন্য। ---- শুধু নিষেধের ফতোয়া শুনিয়ে গেলে ত হবে না—তার ক্ষুধা নিবারণ করবার পথ করতে হবে। নতুবা একদিন এই সুদ-জর্জরিত মুসলমান হয় ধ্বসে যাবে, নয় নৃশংস বিপ্লবের আগুন জ্বালাবে। ---- যৌথ উৎপাদন সমিতি, যৌথ ক্রয়-বিক্রয় সমিতি, যৌথ শিল্পসমিতি দ্বারা ঋণ-জর্জরিত মুসলমানকে, তার শক্তি-সামর্থ্যকে, কাজে লাগাবার চেষ্টা করা প্রয়োজন।"[৬]

ইসলামের বিকাশশীল সত্য আদর্শের প্রতি আবুল হুসেন কখনই আস্থা হারাননি বরং তাঁর সমাজচিন্তামূলক প্রতিটি প্রবন্ধে হযরত মুহাম্মদের প্রসঙ্গ এনে তিনি ইসলামের আদর্শ ও দৃঢ়তার কথাই প্রমাণ করেছেন। কিন্তু সে আদর্শকে যখনই হীন স্বার্থবুদ্ধি আর গোঁড়ামি ও মূর্খতার কাছে হেয় হতে দেখেছেন, তখনই আবুল হুসেন ক্ষুব্ধ না হয়ে পারেননি। প্রতিবাদ করেছেন, রুষ্ট হয়েছেন সমাজ-সংস্কারকের ধর্মের অপব্যাখ্যায়। আর এই প্রতিবাদের ভাষায় স্বাতন্ত্র্যে ও বলিষ্ঠতায় 'সত্য', 'নিষেধের বিড়ম্বনা' ও 'আদেশের নিগ্রহ' প্রবন্ধে জ্ঞান ও সত্যকে সমার্থক দেখেছেন এবং সত্য সন্ধানের সঙ্গে খোদার সেবার সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন অনুভব করেছেন।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হুসেন ইসলাম ধর্মকে উদার নৈতিক মনোভাব নিয়ে দেখেছেন। ইসলাম ধর্মের শরীয়তের সত্য দিকগুলোর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। আল্লাহ রাসুল ও কোরান হাদিসের গূঢ় সত্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এবং সে সত্যের প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। ধর্মের সত্যের চেয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে বড় করে দেখতে তিনি সমর্থন দেননি। আবুল হুসেনের ভাষায়, "আমরা খোদার গুণ লাভ করতে প্রয়াসী হব, তবে বড় হব।"[৮] তিনি আরও লিখেছেন, "জ্ঞানের সহিত খোদার প্রতি ভক্তি মিলিত হওয়া চাই। সত্য সন্ধানের পথ সহজ হয় বদান্যতায়। খোদার ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা বিলীন করে দাও—তুমি মানুষের সমাজে থেকেই সত্যপথ সহজে বের করে নিতে পারবে। সংসার ছেড়ে যেতে হবে না। সংসারে থেকে যে সত্য লাভ করে, সেই ত প্রকৃত মহৎ। ইসলাম তোমাকে, সংসারকে জয় করে মানুষ হতে সহায়তা করে। তার অনুষ্ঠান সত্যের পথ দেখিয়ে দেয়।"[৯]

আবুল হুসেন জানতেন ইসলাম ধর্মে বৈরাগ্যের স্থান নেই। সংসার ধর্ম পালনের মধ্যেই সত্যকে পাওয়া যায়, খোদার সান্নিধ্য লাভ করা যায়। আবুল হুসেন এ সত্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন বলেই সমাজপতিরা তাঁর 'শতকরা পয়তাল্লিশের কোটার' কঠোর সমালোচনার বিরুদ্ধে প্রবল ভাবে সক্রিয় হয়েছিলেন। তিনি জানতেন সত্যই মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করে। 'সত্য' প্রবন্ধে তাই তিনি উল্লেখ করেন, "কাজকে নিজের দাস কর, কাজের দাস হয়ো না। তা হলে অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত বোধ করে ছায়ার সন্ধানে ফিরবে। সত্য পিছনে পড়ে থাকবে। নিজেকে জয়ী করবার জন্য যে যুদ্ধ করতে হয় তার চেয়ে মহাযুদ্ধ আর কি হতে পারে ? আমাদের সকল প্রয়াস আমাদের আত্মশক্তিকে জয়ী করবার জন্য—পবিত্রতার পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য নিযুক্ত হউক।"[১০]

পরিশ্রম ও কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে আবুল হুসেনের অভিমত হলো, "আমরা মাছ খাই, কিন্তু মাছের চর্চা করি না—প্রকৃতির উপর ভরসা করে বসে থাকি। ---- আমরা মুরগি খাই, ডিম খাই, কিন্তু তার চর্চা করি না, মুরগির চাষ আমরা বুঝি না। ছাগলের গোস্ত খাই, কিন্তু ছাগলের চর্চা করি না, গরুর দুধ খাই, কিন্তু দুধের চর্চা করি না। সমস্ত প্রকৃতির উপর ভরসা করে বসে থাকি। তাই দিন দিন এ সমস্ত জিনিস অত্যন্ত মহার্ঘ হয়ে উঠেছে। আমাদের যুবকগণ যদি এদিকে তাদের শক্তি ও মস্তিষ্ক প্রয়োগ করতে লেগে যায়, তাহলে

Dhaka University Institutional Repository

অচিরে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করতে সমর্থ হবে এবং দেশের লোক মাছ, মাংস, ডিম, দুধ প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে খেতে পারবে। এতে দেশের শ্রী, স্বাস্থ্য ও রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করবার শক্তি দিন দিন বাড়তে থাকবে।"[১১] তিনি প্রশ্ন করে বলেন, প্রকৃতি আর কত দেবে। আবুল হুসেন মনে করেন, আমাদের মস্তিষ্ক ও পরিশ্রম যুক্ত না হলে প্রকৃতি কাউকে কিছু দেয় না। তাই প্রকৃতির উপর এই অন্ধ নির্ভরশীলতার কারণে মুসলমানদের যে সবল সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, তা উল্লেখপূর্বক আবুল হুসেন সে সবের সমাধানের পথও দেখিয়ে দিয়েছেন।(তাঁর চিন্তাশীল মৌলিক ধারণা শুধু বাংলার শিক্ষিত মুসলমান তরুণ যুবকদের উদ্দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে; যেমন- শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন, জীবনচর্চা ও সাহিত্যে সমভাবে প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর বিভিন্নমুখী রচনাই এর প্রমাণ।)

'আদেশের নিগ্রহ' প্রবন্ধে আবুল হুসেনের যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় তা শুধু প্রতিবাদী নয়—বিদ্রোহী চেতনারও ইঙ্গিত বহন করে। এ প্রবন্ধটি প্রকাশের কারণে আবুল হুসেন শুধু সমালোচিতই হননি, রক্ষণশীল গোড়া মুসলমান সমাজপতিদের দ্বারা আক্রমণের শিকারও হয়েছিলেন। এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে *মোহাম্মদী* সম্পাদক মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ বিরূপ মন্তব্য করে লেখেন, এই প্রবন্ধে মুসলমান ও ইসলাম ধর্মের উপর যেরূপ আক্রমণ করা হয়েছে তাতে আর্য-সমাজ ও খৃষ্টান মিশনারিরাও তার কাছে হার মানবে। আবুল হুসেনের অপরাধ মিশনারিদের চেয়েও মারাত্মক।[১২]

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর এই মন্তব্য থেকে আমরা 'আদেশের নিগ্রহ' প্রবন্ধটির স্পর্শকাতরতা সম্পর্কে অনুমান করতে পারি। তবে প্রবন্ধটির গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে যে, যাঁরা ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যের প্রতি উদাসীন হয়ে ধর্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠানকে বড় করে দেখেছেন, তাঁদের ভুল ভেঙ্গে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আবুল হুসেন এ প্রবন্ধটি রচনা করেন। তিনি মনে করেন, "মানুষ মাত্রেরই একটা না একটা ধর্ম-বিশ্বাস আছে; অর্থাৎ মানুষ মাত্রই কোন না কোন ধর্মগুরুর আদেশ মেনে চলে। তার বিশ্বাস, সেই ধর্মগুরু বিধাতার প্রেরিত শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তাঁর খাস উপকরণ দিয়ে সৃষ্ট এবং সাধারণ মানুষ ঢের নিকৃষ্ট উপকরণে গঠিত। এই ধর্ম-বিশ্বাস আদিম মানব প্রকৃতির একটি প্রধান লক্ষণ। ভয়, দুর্বলতা ও অজ্ঞতা—এই তিনটি মনোভাব এই ধর্ম-বিশ্বাসের জননী। যে জাতি, অর্থাৎ যে জাতির মন

Dhaka University Institutional Repository

এখনও ন্যাংটা বর্বর যুগের কাছাকাছি পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে, সে জাতির ভয়, দুর্বলতা ও অজ্ঞতা তত বেশী, সুতরাং তার ধর্ম-বিশ্বাসও তত প্রগাঢ়, অর্থাৎ ধর্মগুরুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালনে সে তত তৎপর এই ভয়ে, পাছে তার কোন অনিষ্ট ঘটে কিংবা তার ধর্মগুরুর প্রদর্শিত পরলোকে দুর্গতি হয়। ---- এক কথায়, যে জাতি যত আদিম প্রকৃতি বিশিষ্ট সে জাতি তত অনুষ্ঠান প্রিয়। এই অনুষ্ঠান অর্থে আমি ধর্মানুষ্ঠান মনে করছি।"[১৩] গুরুর আদেশ ও ধর্মের অনুশাসনকে অকাট্য ও জীবনের একমাত্র অবলম্বন মনে করে অনেকেই উপানুষ্ঠানে আসক্ত হয়ে পড়েছিল। এই আসক্তির কারণে পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ জন্ম নেয়। আবুল হুসেন লেখেন, "মানবের ইতিহাস ধর্ম-বায়ুগ্রস্ত মানুষের পরস্পর দ্বন্দ্ব, দ্বেষাদ্বেষির কলঙ্কে অতি নির্মমভাবে কলঙ্কিত। এ কলঙ্ক অপনোদন করতে হলে মানবের প্রতি পরস্পর প্রীতিই চরম ধর্ম বলে ধরতে হবে।"[১৪] তিনি বলতে চেয়েছেন,"কোন ধর্মই সর্বকাল সর্বদেশ ও সমস্ত মানবজাতির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এ ধারণা যে জাতির আছে সে জাতি নিতান্ত হতভাগ্য এবং বলতে হবে তার মন সভ্যতার নিম্নস্তরে পড়ে নীরস ধর্মাদেশের মরু-বালুকায় আপনার জীবনস্রোত হারিয়ে ফেলেছে)। সমস্ত ধর্মের বৈশিষ্ট্য প্রণিধান করলে দেখতে পাওয়া যায়, সমস্ত ধর্মেরই মূলসূত্র হচ্ছে দুইটি; যথা, (১) বিশ্বের সমস্ত বস্তুর স্রষ্টা একজন আছেন এবং (২) মানব মাত্রই মৃত্যুর অধীন।"[১৫] তিনি মনে করেন, ইসলাম ধর্মও অন্যান্য ধর্মের ন্যায় কতকগুলি আদেশ ও নিষেধের সমষ্টি মাত্র। তবে এই আদেশ এবং নিষেধগুলো মুসলমান সমাজ মানতে নারাজ। এ প্রসঙ্গে আবুল হুসেন বলেন, "যখন দেখছি মুসলমান নামধেয় মানুষগুলির মধ্যে শতকরা ৯০ জন ঠিক ইসলামের উদ্দেশ্য-সম্মত বিধি-নিষেধ মেনে চলছে না, অর্থাৎ চলতে পারছে না, তখন কি করে বলি—ইসলাম সনাতন, উহা চিরকাল সর্বত্র সর্বাবস্তায় প্রযোজ্য? বরং বলতে চাই, তাঁরা মান্‌ছে না, কারণ তাঁরা মান্‌তে পারছে না। এতে আমি এই ইঙ্গিত করতে চাই যে, এর জন্য মানুষ যতই দোষী হউক না কেন, বিধি-নিষেধেরও কিছু কিছু দোষ আছে, মোদ্দাকথা, ইসলামের বিধি-নিষেধ পালন করতে গিয়ে মুসলমান আজ কতকগুলি ভণ্ড, প্রাণহীন, গর্হিতরুচি, বুদ্ধি-বিবেকহীন জীবে পরিণত হয়েছে। মুসলমান নেতৃবৃন্দ এদিকে দৃক্‌পাতও করছেন না, বরং সমস্ত 'ধামাচাপা' দিয়ে তাঁরা সমাজে সাচ্চা বনে বসেছেন।"[১৬] আবুল হুসেন এই 'ধামাচাপা' দেওয়ার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। এই

Dhaka University Institutional Repository

বিরুদ্ধাচরণের জন্যে তৎকালে তাঁকে মুসলিম সমাজপতিরা ধর্মদ্রোহী হিসেবে অভিযুক্ত করে তাঁর শাস্তির আয়োজনও করেন।

আবুল হুসেনের সূক্ষ্ম উপলব্ধি ও তীব্র অনুভূতি আর বেদনা ও বক্তব্যের গুরুত্ব অনুভব করার পরিবর্তে ধর্মান্ধ মুসলমান সমাজ এর অপব্যাখ্যা করেছেন এবং নানা রকম হুমকিও দিয়েছেন। এ হুমকির প্রতিবাদ স্বরূপ আবদুল কাদির *শান্তি* (১৩৩৬) পত্রিকায় 'শাস্ত্র বাহকের হুমকি' নামক প্রবন্ধে মুসলমানদের প্রতি আবেদন জানিয়ে লেখেন, "মুসলমান সমাজে মূর্খ চিরকালই পণ্ডিতকে শাসাইয়া আসিয়াছে; আল্ মামুন, ইব্নে রুশদ, আকবর, দারাশিকোহ্র পরাজয় মুসলমান জনসাধারণের হাতে চিরকাল ঘটিয়াছে। নূতন কথা বা মস্তিষ্কবানের সূক্ষ্ম চিন্তাকে গ্রহণ করিবার মতো নিরাসক্ত নির্মলচিত্ত ও উদার বিচারবুদ্ধি কবে মুসলমান সমাজে সম্ভব হইবে, কে জানে? মুসলিম বাঙলার তরুণ সংস্কারকদের সংস্কার-প্রচেষ্টার প্রতি বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া *মোহাম্মদী* পত্রিকা লিখেছেন,—'হিন্দুরা নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে যাহা বলেন বা করেন, সেরূপ একটা কিছু বলাকে বা তাহার অনুরূপ একটা কিছু অভিনয় করাকেই ইহারা নিজেদের শিক্ষিত বিশ্বরূপের চরম সাফল্য মনে করিয়া থাকে ---- ইহাদের প্রত্যেক উক্তি, প্রত্যেক যুক্তি, প্রত্যেক প্রলাপ ও প্রত্যেক প্রগতিই পরের অন্ধ অনুকরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে।"[১৭] ধর্মের প্রশ্নে মুসলমান সমাজের প্রচলিত ধারণা, 'বিশ্বাসে মিলায় স্বর্গ, তর্কে বহুদূর'।

বিশ্বাসকে বুদ্ধির দ্বারা যাচাই করে তবে ভালমন্দ নির্ণয় করা আবশ্যক। মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনের উদ্গাতাদের এটাই ছিল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাদের ধারণা শুধু বিশ্বাস ও আবেগহীনভাবে যুক্তির আলোকে ধর্ম গ্রহণ করার প্রয়াস কখনও সুফল অর্জন করেনি। আবুল হুসেনের মতে "তাই তাদের নিকট ধর্ম ও সংসার বিভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'সংসারের উন্নতির জন্যই মূলতঃ ধর্ম-বিধানের সৃষ্টি' এ-কথা তাঁরা স্বীকার করতে চাচ্ছে না। ---- এই বিধি-বিধান বা ধর্মগুরুর আদেশের নিগ্রহ হতে মুক্তি না পেলে মুসলমান ত মানুষ হবেই না, বরং ইসলামও কেবল পুঁথিগত dead letter হয়েই থাক্বে, যেমন কোরান-হাদিস বাংলার সাধারণ মুসলমানের নিকট বন্ধ করা (Sealed) একখানি পুস্তক ব্যতীত আর কিছুই নয়, যে পুস্তক হতে তাঁরা কিছুই গ্রহণ করতে পারে না বা যার কথা শুনেও তাঁরা তাদের জীবনে

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োগ করতে পারে না অর্থাৎ পারছে না। তবে অনুষ্ঠান পালনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে বলে তাঁরা এখনও মুসলমান। তাই মাত্র টুপি, লুঙ্গি, দাড়ি, এই বাহ্যিক নিদর্শন দ্বারাই তাঁরা তাদের মুসলমানত্ব প্রমাণ করছে। কোরান-হাদিসের সমস্ত বিধি-নিষেধের ফল মুসলমানের জীবনে শুধু টুপি, লুঙ্গি, দাড়িতেই প্রকাশ পেয়েছে: তার বাইরে মুসলমানের আর কি কি নিদর্শন চাই মানুষের দিক থেকে, তার প্রতি লক্ষ্য আমাদের সমাজপতিদের আছে বলে মনে হয় না।"[১৮]

আবুল হুসেন মনে করেন শুধু অনুষ্ঠান আর ধর্মীয় অনুশাসন কিংবা বাইরের বেশ ভূষায় আসক্তি দেখালে প্রকৃত মুসলমান বলে প্রমাণিত হয় না। প্রকৃত মুসলমান হতে হলে ধর্মগুরুর আদেশের নিগ্রহ থেকে মুক্তি লাভ করতে হবে। শুধু বাইরের পোষাক-পরিচ্ছদ দিয়ে মুসলমানত্ব প্রমাণ করার মধ্যে কোন গৌরব নেই। কোরান-হাদিসের অর্থ বুঝে তা জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করতে হবে। আবুল হুসেনের মতে, "এ বিষয়ে সমাজপতিরা উদাসীন ত বটেনই, বরং তাঁরা ঐ সমস্ত অবৈধ আচারপরস্ত ভদ্র মুসলমানকেই আদর্শ মুসলমান বলে ধরেন, কারণ তাঁরা নামাজ পড়েন। নামাজ পড়লেই সাত খুন মাফ। কু-কর্মের চূড়ান্ত কর, কিন্তু মস্‌জিদে এসে মাথা ঠুকে যাও, তোমার সমস্ত পাপ ধুয়ে যাবে। কি চমৎকার ধর্ম ! এইরূপ নামাজের দোহাই দিয়েই মুসলমান আজ নানা প্রকার অনাচার-অপকর্মে নিপুণ হয়ে ওঠছে।"[১৯]

রফিকুল ইসলাম তাঁর 'প্রতিবাদী-বিদ্রোহী চিন্তার একদিক' প্রবন্ধ আবুল হুসেনের 'আদেশের নিগ্রহ' প্রবন্ধের আলোচনায় ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত কতকগুলো প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। প্রশ্নসমূহ হলো : প্রথমতঃ "হযরত মোহাম্মদ (সঃ) প্রবর্তিত ইসলামের রূপ শত শত বৎসর ধরে অপরিবর্তিত থাকা সম্ভব, দ্বিতীয়তঃ বেহেশ্‌তের আশ্বাস এবং দোজখের ভয় সর্বদা মুসলমানকে ধর্মীয় বিধান পালনে বাধ্য করতে সক্ষম কি না, তৃতীয়তঃ ধর্মের ভিত্তি কি হওয়া উচিত — বিশ্বাস না যুক্তি?"[২০] আমরা জানি ইসলাম ধর্ম কতকগুলি আদেশ ও নিষেধের সমষ্টি। যা মেনে চলাই ধর্ম। আবুল হুসেন মনে করেন, "দোজখের ভয় ও বেহেশ্‌তের লোভই মুসলমানকে ইসলামের আদেশ-নিষেধ মেনে চল্‌তে প্রবৃত্ত করে। কিন্তু দোজখ ও বেহেশ্‌তের বর্ণনা হতে কোন মুসলমানই তার প্রকৃত স্বরূপ বুদ্ধির দ্বারা ধারণা করতে পারে না। কেবল বিশ্বাসই তার একমাত্র সম্বল। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধি যে বস্তুকে ধরতে

Dhaka University Institutional Repository

পারে না, বিশ্বাস দ্বারা তাকে বেশীক্ষণ ধরে রাখা যায় না। বুদ্ধির প্রয়োগ যেখানে অনাবশ্যক বা অনর্থক সেখানে বিশ্বাস শিথিল হতে বাধ্য। তাই মুসলমানের কার্যকলাপ দেখ্‌লে বেশ বুঝা যায় যে, সাধারণ মুসলমান দোজখ বেহেশ্‌তের বিশেষ পরোয়া করে না।"[২১] আবুল হুসেন মুসলমান সমাজের এ অবস্থার কারণ হিসেবে বিচারহীন ধর্মাচরণকে চিহ্নিত করেছেন। এ কারণে মুসলমান সমাজ বিশেষ করে গোড়া রক্ষণশীল সমাজে যে কী-রূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল—তা অনুমান করা যাবে *মোহাম্মদী* সম্পাদক মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, আবুল হুসেন তথা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর লেখকদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি যে কটাক্ষ করেছেন, আবদুল কাদির তাঁর 'শাস্ত্র বাহকের হুমকি' প্রবন্ধে এর প্রত্যুত্তরে বলেন, "শিক্ষা-দীক্ষার যিনি বাস্তবিকই অধিকারী, তিনি যদি অপরের শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধে কটাক্ষ করেন, তবে তাহা গর্হিত হইলেও অশোভন হয় না। কিন্তু মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের এ কটাক্ষকে আস্ফালন ভিন্ন আর কি বলিব? কেহ শিক্ষিত কিনা, সাধারণতঃ তার দুই পরিচয় - (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি, (২) তাঁর নিজের প্রতিভার পরিচয়। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে, মওলানা আকরম খাঁর 'মওলানা'-উপাধি তাঁর নিজেরই কাগজের *(মোহাম্মদী)* দেওয়া এবং সমাজের 'আসল' মওলানাদের আসরে আসন পাওয়ারও স্পর্ধা তিনি করিতে পারেন না।"[২২]

আবুল হুসেনের 'আদেশের নিগ্রহ' প্রবন্ধের কিছু অংশ *শান্তি* পত্রিকা থেকে সঙ্কলন করে *বাংলার বাণী*তে প্রকাশিত হলে তা *মোহাম্মদী* সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। *মোহাম্মদী* সম্পাদকের এরূপ বিরোধিতার মূল কারণ হচ্ছে 'আদেশের নিগ্রহ' প্রবন্ধটি মুসলমান লেখকের কিন্তু তা প্রকাশিত হয়েছে হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত *শান্তি* পত্রিকায়। এ প্রসঙ্গে আবদুল কাদির লেখেন, "আবুল হুসেন সাহেবের লেখাটি 'হিন্দু পত্রে' প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া *মোহাম্মদী*-সম্পাদক মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ তাঁহার প্রতি বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই জন্য মুসলমান পত্রিকাওয়ালাদের কি লজ্জিত হওয়া উচিত নয়? বিশেষতঃ *মোহাম্মদী*র এই কথা বলিয়া রক্তচক্ষু প্রদর্শন করা নির্লজ্জতার পরাকাষ্ঠা দেখানো নয় কি? *মোহাম্মদী* আজিও বিস্মৃত হন নাই যে, (১) আবুল হুসেন সাহেবের প্রেরিত 'মোস্তফা-চরিত্রের সমালোচনা' (২) 'শতকরা পঁয়তাল্লিশের জের' নামক

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবাদের প্রতিবাদ, (৩) কাজী আবদুল ওদুদ সাহের-এর *মোহাম্মদীর* 'ধৃষ্টতার পরাকাষ্ঠা, শীর্ষক আলোচনার প্রতিবাদ, ইত্যাদি *মোহাম্মদীতে* প্রকাশার্থ পাঠান হইলে *মোহাম্মদী* সে-সমস্ত লেখা প্রকাশিত করেন নাই, উপরন্ত লেখা ফেরত পাঠাইবার ডাক টিকিট পুনঃ পুনঃ পাঠান সত্ত্বেও সে-সমস্ত লেখা ফেরত পর্যন্ত পাঠান নাই। মুসলমান পরিচালিত পত্রিকায় স্থান না পাইয়া যদি কোনো লেখক তাঁহার রচনা হিন্দু পত্রিকায় প্রকাশ করেন, তাহাতে রচনা-ধৃত সত্যের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। ---- নিজেদের পত্রিকার অভাবে নিরুত্তর না থাকিয়া হিন্দুপত্রের সহায়তায় সত্যজিজ্ঞাসু মুসলমান সমালোচকদের এই সমস্ত প্রলাপ ও হুমকীর যথাযোগ্য উত্তর দিতে আসা প্রবীণ *মোহাম্মদীর* যে সমর্থন-অযোগ্য হইবেই, তাহাতে বিচিত্র কি?"[২৩] *মোহাম্মদীর* এ মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় এখানে শেষ হয়ে যায়নি। কাজী আবদুল ওদুদ *মোহাম্মদীর* মন্তব্যকে 'আপত্তিজনক' বলে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, এমনিভাবে মেজাজ দেখিয়ে আমাদের সাহিত্যে ও সমাজ-জীবনে কি লাভ হতে পারে? তিনি প্রাচীনপন্থীদেরকে মনীষা ও সুদৃষ্টান্তের দ্বারা 'নবীনপন্থী'দের বক্তব্য খণ্ডন করতে আহ্বান জানান নতুবা কোলাহলের দ্বারা তাঁদের পরাভবের লজ্জা বাড়বে মাত্র বলে মন্তব্য করেন।[২৪]

'আদেশের নিগ্রহ' প্রবন্ধে আবুল হুসেন মুসলমানদের নিকট ইসলাম ধর্মের সত্যাসত্য তুলে ধরে লেখেন, "কিন্তু মুসলমান ধর্মের পুরোহিত এই মূক প্রতিবাদের অর্থটি বুঝবেন কি? এখন আর বোধ হয় চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে না যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবন সুন্দর করবার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত ধর্মাদেশ ইসলামের মারফতে প্রচারিত হয়েছিল তার পরিণতি আজ সাধারণ মুসলমানের জীবনে কি কদর্য চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছে—সে জীবনে সত্যকার ধর্মস্পৃহা ঘুচে গেছে, সে জীবন এখন আস্ফালন, অভিমান, মিথ্যা গর্ব, ভণ্ডামি, মূর্খতা ও রুচিহীনতায় পূর্ণ হয়ে ওঠছে।"[২৫]

আবুল হুসেন আরো কয়েকটি আবশ্যকীয় আদেশের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন 'আদেশের নিগ্রহ' প্রবন্ধে। তিনি বিধবা বিবাহের প্রশ্নে মুসলমানদের উদাসীনতা ও বহু বিবাহের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধি-বিধানের অপব্যবহার সম্পর্কে লেখেন, "এই যে বিধবা-বিবাহ ব্যাপারটি, যার প্রবর্তনের জন্য হিন্দু সমাজ আজ প্রায় একশত বৎসর ধরে নানা প্রকার চেষ্টা করেছেন, এমন কি রাজ-সরকারের মারফতে আইন পর্যন্ত রচিত হয়েছে,

Dhaka University Institutional Repository

সেই বিধবা-বিবাহ আজ মুসলমান সমাজে অনেকটা ঘৃণ্য ও লজ্জাকর ব্যাপার হয়ে উঠেছে। বিশেষতঃ শিক্ষিত ও বনিয়াদি ভদ্র মুসলমানই এ বিষয়ে অগ্রণী। তাঁরা বিধবা বিবাহ দিতে পর্যন্ত অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন, ক্রমে এ বিষয়ে তাঁদের দৌর্বল্য দারুণ হয়ে ওঠ্ছে। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে কেবল কৃষিজীবি মুসলমানদের মধ্যেই বিধবা-বিবাহ একটু চল্ছে, কারণ বিধবা একটু বয়স্কা বলে তাদের সংসারের উন্নতির জন্য বিশেষ কাজে লাগে। কিন্তু তারাও আজকাল সভ্য ভদ্র মুসলমানকে অনুকরণ করতে অগ্রসর হচ্ছে।"[২৬] বিধবা-বিবাহ ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু সমকালীন মুসলমান সমাজে একে অনেকেই লজ্জাকর কাজ বলে গণ্য করেছে।

(আবুল হুসেন ইসলাম ধর্মের কোন কোন আদেশকে সামাজিক নিগ্রহের কারণ বলে অভিহিত করেছেন। যেমন নারীর পর্দা ও বোরকা পরার আদেশ এর অন্তর্ভুক্ত। পর্দার মূল উদ্দেশ্য নারীর সতীত্ব রক্ষা করা। আবুল হুসেন লক্ষ করেছেন, পর্দা ও বোরকা নারীর সতীত্ব রক্ষার পরিবর্তে সতীত্ব নষ্ট করছে। তাই এ প্রথা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য অনেকের চেয়ে ভিন্ন।) তাঁর মতে, "পর্দ্দা আজ মুসলমান নর-নারীর পাশবিক প্রবৃত্তি প্রখর করে তুলবার জন্য একটি ব্রহ্মাস্ত্র হয়ে ওঠেছে। এতে তাদের দুর্বলতা, নির্লজ্জতা, সঙ্কীর্ণচিত্ততা, হৃদয়হীনতা, রুচি-বিকৃতি, কাপট্য, স্বাস্থ্যহীনতা, মস্তিষ্ক-চর্চার প্রতি ঔদাসীন্য, কর্মে বিগত স্পৃহা ও আলস্য দিন দিন বেড়ে চলেছে। নারীকে পর্দায় রাখা হয় এই উদ্দেশ্যে যে তার প্রতি পুরুষের দৃষ্টি না পড়ে এবং তার সতীত্ব নষ্ট না হয়। ---- এই সতীত্ব রক্ষার উপায় পর্দা; কিন্তু বর্তমান মুসলমান সমাজে পর্দা এই সতীত্ব নষ্ট করবার চমৎকার একটি উপায়ে পরিণত হয়েছে। পর্দার অন্তরালে মুসলমান নারীর দুর্বলতা এরূপে লালিত হতে থাকে যে, তার ব্যক্তিত্ব একেবারে পুষ্টিলাভই করতে পারে না, ফলে সামান্য ইঙ্গিতে বা প্রলোভনেই সে পাশবিক লালসার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে বাধ্য হয়—কারণ পর্দা তাকে অতি শৈশব হতেই ঐ একটি মাত্র বস্তু অর্থাৎ সতীত্বের কথা ভাবতে অভ্যস্ত করতে গিয়েই ঐ লালসাকেই পুষ্ট করে তোলে।"[২৭] দেখা যায়, মুসলমান নারীর স্বাস্থ্যহীনতা ও কর্মে উদাসীনতা এবং তাদের সংসারে নিরানন্দ ও বন্ধ্যত্বের জন্যে আবুল হুসেন এই লোক দেখানো প্রথাকেই দায়ী করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হুসেনের 'নিষেধের বিড়ম্বনা' ও 'আদেশের নিগ্রহ' এবং কাজী আবদুল ওদুদের 'সম্মোহিত মুসলমান' প্রবন্ধগুলো মাসিক *অভিযান* পত্রিকার ১৩৩৩ সংখ্যায় ছাপা হলে *মোহাম্মদী* ও *দৈনিক সুলতান* পত্রিকায় এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়। *মোহাম্মদী* সম্পাদক মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ 'নব পর্যায় না নব পর্যয়' শীর্ষক নিবন্ধে প্রবন্ধের কঠোর সমালোচনা করেন। আবুল হুসেন মাসিক *জাগরণ* বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ সংখ্যায় 'সব জান্‌তা' শিরোনামে তার জবাব দেন। এই জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে মৌলভী দলিল উদ্দীন আহমদ লেখেন, 'কুছ নেহী জান্‌তা'।[২৮] 'আদেশের নিগ্রহ' ও 'নিষেধের বিড়ম্বনা' প্রবন্ধদ্বয়ের বক্তব্য ও আবুল হুসেনকে উপলক্ষ্য করে সমকালের পত্র-পত্রিকায় সৃষ্ট বাদ-প্রতিবাদের এক পর্যায়ে ঢাকার শিক্ষিত মুসলমান সমাজে আবুল হুসেন বিরোধী উত্তেজনার এক আবহ সৃষ্টি হয়। স্থানীয় উর্দূ ভাষীদের নিকটও এ প্রবন্ধের বক্তব্য বিকৃত করে বুঝানো হয়। সে কারণেই আবুল হুসেনকে একবার ঢাকার বলিয়াদি জমিদার কাজেম উদ্দীন সিদ্দিকীর বাড়িতে, আর একবার নবাব বাড়ীর আহসান মঞ্জিলে প্রকাশ্য বিচার সভার মুখোমুখি হতে হয়েছিল, বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য। আবদুল কাদির লেখেন, "তখন সে-সম্পর্কে আলোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর রবিবার রাত্র ৭ ঘটিকার সময় ঢাকা 'আহসান-মঞ্জিলে 'ইসলামিয়া-আঞ্জুমান'—অফিসে এক বিশেষ সভার অধিবেশন হয়; সভায় আবুল হুসেন হুমকীর মুখে এই বলে 'ক্ষমাপত্র' লিখে দেন: 'ঐ প্রবন্ধের ভাষা দ্বারা মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের মনে যে বিশেষ আঘাত দিয়াছি, সেজন্য আমি অপরাধী।"[২৯]

স্বকীয়তা ও নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে গিয়ে মাথা নত করাকে আবুল হুসেন তাঁর নৈতিক পরাজয় বলে মনে করেছেন। বিবেকের এই গ্লানি নিয়ে এক মুহূর্ত 'সাহিত্য সমাজে'র সম্পাদকের পদ দখল করে থাকাকে তিনি উচিত মনে করেননি। পর দিনই ৯ ডিসেম্বর, ১৯২৯ তিনি 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র সম্পাদক ও *শিখার* সাধারণ সদস্য পদ থেকেও পদত্যাগ করেন। এ উপলক্ষ্যে লেখা *সঞ্চয়* (মাসিক) পত্রিকায় প্রকাশিত 'একখানি পত্রে' পদত্যাগ করার উদ্দেশ্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, "মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল চিন্তাচর্চা করা। কিন্তু বর্তমান মুসলমান সমাজে চিন্তা-চর্চা করা অসম্ভব বলে মনে করি। আর সম্ভব হলেও যে উপায়ে চিন্তাচর্চা করলে বর্তমান মুসলমান সমাজের বাহবার পাত্র

Dhaka University Institutional Repository

হওয়া যায়, তাতে প্রকৃত পক্ষে চিন্তাচর্চার মূল উদ্দেশ্যটি সার্থক হয় না, বরং তাতে চিন্তাচর্চা রুদ্ধ হয়। সম্প্রতি আমার 'আদেশের নিগ্রহ' নিয়ে যে আন্দোলন হয়েছে, তাতে আমি এটুকু বুঝতে পেরেছি যে, সমাজের প্রকৃত কল্যাণাকাঙ্ক্ষী দার্শনিকের কথায় কেউ কর্ণপাত করবে না, বরং তাঁর কথার উল্টা অর্থ করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করবে। ---- কর্মের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার সর্বপ্রথম কর্তব্য। সে জন্যই আমার চিন্তাচর্চা করা। এখন আমার চিন্তার ফল যদি জনসাধারণকে কর্মের প্রতি আগ্রহান্বিত না করতে পারে, বরং তার প্রতি আরও বেশী উদাসীন করে তোলে, তা হলে আমার উদ্দেশ্যটি ব্যর্থ হবে। গতকল্য সন্ধ্যার পর 'আহসান-মঞ্জিলে' একটি ছোটখাট মজলিস হয়েছিল। ---- তাতে সমবেত ব্যক্তিবর্গ একবাক্যে যে রায় দিলেন, ---- এই রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা নিরর্থক। কালই এর পুনর্বিচার করবে। তবে এখন বর্তমান মুসলমান সমাজের মধ্যে থেকে যখন আমি কাজ করতে চাই, তখন বাধ্য হয়ে আমাকে এই রায় মাথা পেতে নিতে হবে এবং আমি নিয়েছি। আমি বলেছি —'আমি অপরাধী'(?)। এর পর আমি আর 'সাহিত্য সমাজে'র সম্পাদক থাকা ত দূরের কথা, সভ্য থাকা ও আমি সঙ্গত মনে করি না। বর্তমান মুসলমান সমাজকে নিয়ে কি উপায়ে কল্যাণের পথ প্রশস্ত করা যায়, তারই চিন্তা করা ছাড়া গত্যন্তর কি?"[৩০] সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলেও আবুল হুসেন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র সঙ্গ ছেড়ে চলে যাননি। কিংবা তাঁর উদ্দেশ্য থেকে সরে দাঁড়াননি তিনি। 'সাহিত্য সমাজে'র ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে তাঁর এই আশাবাদী মনোভাবের প্রকাশ ঘটে। সেই ভাষণের কিছু অংশ উদ্ধৃত হলো, "এই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে 'চিন্তাচর্চা'। মানুষের জীবন নিয়ত গতিশীল ও পরিবর্তন প্রিয়। চিন্তা সেই গতির অগ্রদূত। বাঙলার মুসলমান সমাজে জীবন-স্রোত রুদ্ধ। সেই জীবন সক্রিয় ও গতিশীল করতে হলে চিন্তা চর্চার প্রয়োজন। এই চিন্তাই সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করবে। সাহিত্য সৃষ্টি হলেই সমাজের কর্মধারা চারদিকে উৎসারিত হবে। গত ছয় বছর এই সমাজে চিন্তাচর্চা হয়েছে। 'শতকরা পঁয়তাল্লিশ' হতে মিশ্র নির্বাচন পর্যন্ত কোন বিষয়েই এই সমাজ আলোচনা করতে ভীত বা কুণ্ঠিত হয় নাই। আপনারা মেহেরবাণী করে যদি সমাজের পাঁচ বৎসরের বার্ষিক *শিখা* পড়েন তা হলেই বুঝতে পারবেন যে, এই সমাজ জীবনকে Seriously নিয়েছে। ---- একটি প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে

Dhaka University Institutional Repository

ছয় বৎসর অতি সামান্য সময়। বিশেষতঃ এই ছয় বৎসরের মধ্যে এই সমাজ উৎসাহ স্থলে পেয়েছে তিরস্কার, সাহায্য স্থলে পেয়েছে গালি। যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদেরও অনেকে প্রকাশ্যে সাহায্য করতে সাহসী হন নাই। তবু আমি আনন্দের সাথে ঘোষণা করছি যে, যাঁরা এই সমাজের পৃষ্ঠপোষক, তাঁদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালে সমাজের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল হবে সে বিষয়ে ভবিষ্যত বাণী করা কিছুমাত্র কঠিন নয়।"[৩১]

আবুল হুসেন স্ব-সমাজ দ্বারা নিগৃহীত হলেও তিনি স্বধর্মী ও স্ব-সমাজের সেবায় ইতি দেননি, তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর পরবর্তী রচনা-সমূহে। এই সামাজিক কল্যাণ চিন্তা আমৃত্যু আবুল হুসেনের সঙ্গী ছিল। *সঞ্চয়* (মাসিক) সম্পাদককে লেখা 'একখানি পত্রে' আবুল হুসেন তাঁর নিজের সম্পর্কে লেখেন, "আমার Position ঠিক দার্শনিকের নয়, আমার Position কতকটা কল্যাণ-পিপাসু সামান্য কর্মীর।"[৩২] আবুল হুসেনের এ বক্তব্য বিনয়, সন্দেহ নেই। সতীর্থ ও সমসাময়িক কালের ঘনিষ্ঠ জন আবুল ফজল-এর বক্তব্য থেকে জানা যায়, তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থেই আত্মপ্রচার বিমুখ, নেপথ্যে থেকে কাজ করতেই পছন্দ করতেন।[৩৩] মুসলিম সমাজে চিন্তাচর্চা যাতে অবারিত হতে পারে এবং তাদের অগ্রযাত্রা যুগের সমতালে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে সেদিকেই ছিল আবুল হুসেনের লক্ষ্য। নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ মুসলমান সমাজ যাতে জ্ঞান চর্চার নব পরিবেশে উদারতার মহান আলো লাভ করতে পারে, সেই ছিল তাঁর সাধনা। আবুল হুসেন স্মরণে আবুল ফজল আরও লেখেন, "তিনি কতখানি আদর্শবাদী আর সমাজ-প্রেমিক ছিলেন তাঁর নিম্নোধৃত মন্তব্য থেকেই তা উপলব্ধি করা যাবে): "একদিন আমার কোন এক বন্ধু বলছিলেন, মুসলমান সমাজের বর্তমান অবস্থা দেখে মুসলমান বলে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করি। তার উত্তরে আমি বলেছিলুম, ঠিক ঐ জন্যই আমি মুসলমান বলে পরিচয় দিতে দ্বিধা বোধ করি না। ---- কারণ এই দুঃস্থ সমাজে জন্মগ্রহণ করে মানুষকে নানা প্রকারে সেবা করবার প্রচুর সুযোগ লাভ করতে পারব। জগতের মহাপুরুষগণ চিরদিনই দুঃস্থ অধঃপতিত জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাদের জীবনস্মৃতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক। এ ছিল আবুল হুসেনের জীবনদর্শন আর দৃষ্টিভঙ্গি।"[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

আমরা জানি ইতিহাসের এক অতীত যুগে ভিন্ন আবেষ্টনে হযরত মহাম্মদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আবুল হুসেন তথা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' মনে করতেন হযরত মহাম্মদ সেখানে যে জীবন-যাপন করেছেন, যে শিক্ষা তিনি দিয়েছেন, তা থেকে এ যুগে এই দেশে বসে আমরা শুধু তাই নেব তা নয়। হযরত মহাম্মদকে ভক্তি দিয়ে নয়, যুক্তি দিয়ে বিচার করে তাঁর আদর্শ ও শিক্ষাকে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু রক্ষণশীল মুসলমান সমাজ অতীতের অন্ধ অনুকরণে বিশ্বাসী ছিলেন। এখানেই *শিখা* পন্থীদের সাথে মুসলমান শাস্ত্রপন্থীদের প্রভেদ। 'সাহিত্য সমাজ' ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। ধর্মের কলে আটকে মুসলমান সমাজের মুক্তি তাঁদের কাম্য ছিল না। এ প্রসঙ্গে মোরশেদ শফিউল হাসান লিখেছেন, "মানবমুক্তি ও বিকাশের পথে প্রধান বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি অতীতের প্রতি মোহ ও প্রাচীন শাস্ত্রানুগত্যকে। আর এর বিরুদ্ধে ছিল তাঁর জীবনব্যাপী সংগ্রাম। যে বিশ্বাস বা বিধি-বিধান মানুষের স্বাধীন বিচারবুদ্ধিকে প্রতিহত করে, তাকে বর্তমানের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার শক্তি ও সাহস যোগায় না, তাকে তিনি শুধু মূল্যহীনই নয়, পরিহারযোগ্য বলেও মনে করেন।"[৩৫]

আবুল হুসেন মনে করেন, যার বর্তমান কদর্য—ভবিষ্যৎ নেই, সেই অতীতের দিকে মুখ ফিরিয়ে অসার আস্ফালন করে। 'অতীতের মোহ' (১৩৩৪) প্রবন্ধে আবুল হুসেন লেখেন, "আদিম স্রষ্টা সৃষ্টির ব্যক্তিগত মোহ 'অতীতের মোহ' রূপে এসে পরবর্তী বংশধরদের জীবন অনেকখানি বিড়ম্বিত করে। তখন নব-প্রভাতের, নব-প্রয়োজনের, নব-সৃষ্টি তার পক্ষে অনেকখানি অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই 'অতীতের মোহ' মানুষের ইতিহাসকে নানা প্রকারে খর্ব করেছে। ---- অতীতের সৃষ্টি অতীতের প্রয়োজনে হয়েছিল, আর আজ বর্তমানের প্রয়োজনে তাকে নতুন সৃষ্টি করতে হবে ----। 'অতীতের মোহে'র এই দৌরাত্ম্য মানুষের চিন্তা ও সাধনার ধারাকে কতখানি রুদ্ধ করেছে, তার ইতিহাস কে লিখবে? 'অতীতের মোহ'-গ্রস্ত মানুষ তার বর্তমান সৃষ্টি ফেলে অতীতের সৌন্দর্য-ঐশ্বর্য দূরবীন দিয়ে দেখে, আর বর্তমানের ত্রুটি, আলস্য, অচেষ্টার অপরাধকে ঢেকে রাখে। তখন অতীতের গৌরব-কাহিনী, অতীতের সত্যযুগ, অতীতের সুবর্ণ সভ্যতার স্বপ্ন দেখ্‌তে দেখ্‌তে আত্মবিশ্বাস ও আপনার সৃষ্টির ক্ষমতা হতে ক্রমশঃ সে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। 'অতীতের মোহ' এমনি বিশাল বিপুল শক্তি

Dhaka University Institutional Repository

যে, মানুষের সৃষ্টির প্রবৃত্তিও তার কাছে মাথা নত করে। যে জাতি যত শীগ্‌গীর এই মোহ কাটাতে পেরেছে, সে জাতি মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের কলেবর তত বেশী বৃদ্ধি করতে পেরেছে। মানুষ সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য মানুষের দুঃখ দূর করা। পাশ্চাত্য জাতির বর্তমান ইতিহাস পড়লে মনে হয় যে, তারা 'অতীতের মোহে' আর মুগ্ধ নয়।"[৩৬] আবুল হুসেন শুধু অতীতমুখী ইতিহাস তুলে ধরে মুসলমান সমাজের সমস্যার কথা বলেননি, ইতিহাসের আলোকে এর থেকে উত্তরণের পথও দেখিয়েছেন। আবুল হুসেনের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি সম্পর্কে আবদুল কাদিরের স্পষ্ট বক্তব্য হলো, "নব্য-ভারতের ভিত্তি পত্তনের জন্যে তিনি অপরিহার্য মনে করিয়াছিলেন সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির পরিহার। এদেশের অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তিনি আপন মনে করিতেন; কিন্তু পুরাতন আচার ও ঐতিহ্যের দৌরাত্ম্য যে আমাদের একালের জীবনে ঘটাইয়াছে বিকৃতি তাহাও তিনি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতেন।"[৩৭]

অতীতের এই মোহে মুগ্ধ ভারতের হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ, হিংসা-কোলাহল ও সংঘর্ষ-বিগ্রহের কারণ হিসেবে আবুল হুসেন হিন্দু-মুসলমানের 'অতীতের মোহ'কে অন্যতম কারণ বলে চিহ্নিত করেন। তিনি লেখেন, "ভারত-ব্যাপী হিন্দু-মুসলমানের বর্তমান দ্বন্দ্ব-দ্বেষাদ্বেষি, হিংসা-কোলাহল, সংঘর্ষ-বিগ্রহ দেখে এই মনে হয়, আহ্ ! উভয় সম্প্রদায় কি নিদারুণ অতীতের মোহে বিড়ম্বিত! হিন্দু দু'হাজার বছর পূর্বের আর্য-শক্তির স্বপ্ন দেখছে, আর মুসলমান আরবি সাম্রাজ্যের কথা ভেবে ক্ষোভে ক্ষুব্ধ হচ্ছে। হিন্দু বল্‌তে চাচ্ছে, 'ভারত হিন্দুর—মুসলমান বিদেশী'। মুসলমান বল্‌ছে, 'আমরা মুসলমান, ভারতে আমরা মুসলমান হয়েই থাকব। ---- এই উভয় মনোভাবের উৎস একই, অর্থাৎ 'অতীতের মোহ'। হিন্দু চায় সেই প্রাচীন আর্যাবর্ত প্রতিষ্ঠা করতে, মুসলমান চায় তাদের প্রাচীন প্রাধান্য কোন প্রকারে ক্ষুণ্ন না হয়।"[৩৮] হিন্দু অতীতের আর্য-শক্তির স্বপ্ন দেখছে আর মুসলমান ভাবছে আরবি সাম্রাজ্যের অতীত গৌরবের কথা। এ প্রসঙ্গে আবুল হুসেন লেখেন, "ফলে তারা ভারতে অহিন্দু মানুষের ঠাঁই দিতে কুণ্ঠিত হয়ে উঠেছে। আজ তাই সবার মুখে শোনা যায়, শুদ্ধি কর, শুদ্ধি কর ভারত হিন্দুর। অন্যান্য যারা এদেশে এসেছে, তারা হিন্দুর স্বাধীনতা হরণ করেছে, সুতরাং তারা হিন্দুর শত্রু। তাই আজ সত্যাগ্রহীর এত আমদানী। হিন্দুর এই

Dhaka University Institutional Repository

মনোভাবের ফলে সংখ্যায় মুষ্টিমেয় মুসলমান স্বভাবতঃই প্রমাদ গুণে, তার আপনার বন্ধুর খোঁজ করতে চায়। তাই সে বৃথা ইরান, তুরান, আফগানিস্তানের দিকে তাকায়।"[৩৯]

আবুল হুসেন একে সুস্থ চিন্তা বলে মনে করেননি। এই মোহগ্রস্ত উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তার মূল উৎস সন্ধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন না তিনি। হিন্দু- মুসলমানের মিলিত এক সমাজ ও এক জাতি গঠন করার আদর্শ প্রচারও ছিল তাঁর লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যে তিনি লেখেন, "হিন্দুকে তার প্রাচীনের মোহ ও সংস্কার ত্যাগ করতে হবে এবং মুসলমানকেও তার সংস্কার ও ধারণার মোহ ত্যাগ করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে উভয়কে দৃঢ়রূপে ধারণা করতে হবে, হাঁ আমরা মানুষ—আমাদের কল্যাণ এক, আমাদের জীবনের সমস্যা এক—আর এজন্য আমাদের তপস্যা ও সাধনা এক পথে চল্‌বে। ---- প্রাচীন ইতিহাস আমাদের গর্ব ও আস্ফালনের প্রশ্রয় না দিয়ে সে ইতিহাসের দৃষ্টান্ত আমাদের বর্তমান সৃষ্টির জন্য অনুপ্রেরণা সঞ্চার করুক, কিন্তু যেন স্তম্ভিত বিড়ম্বিত না করে। সে সৃষ্টির চেয়ে আরও বৃহত্তর সৃষ্টির ক্ষমতা আমাদের হয়েছে, এ বিশ্বাস যেন আমাদের কর্মে উৎসাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে। ইতিহাস আমাদের জন্য- আমরা ইতিহাসের জন্য নই। আমরা আরো উজ্জ্বলতর ইতিহাস রচনা করব, এ বিশ্বাস যেন আমাদের ক্ষুণ্ন না হয়। আমরা যেন প্রাচীন হিন্দুর সৃষ্টি ও প্রাচীন মুসলমানের সৃষ্টি সমানভাবে মানুষের সৃষ্টি মনে করি ও অন্তরের সহিত তাতে গৌরব অনুভব করতে পারি।"[৪০] হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অনুপ্রেরণার ইঙ্গিত দিয়ে মিলনের পথে বাধাগুলোর স্বরূপ উন্মোচন করে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় চেতনাবোধ, বুদ্ধি ও চিন্তায় হিন্দুর চেয়ে মুসলমান অনেক পেছনে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় চেতনা যদি পরস্পরের মধ্যে মন ও মানসিকতার দিক থেকে সমপর্যায় ভুক্ত না হয়, তা হলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন বন্ধন দৃঢ়তর হবে না। আবুল হুসেন একথা জানতেন এবং জানতেন বলেই মুসলমান সম্প্রদায়কে এগিয়ে নেওয়ার জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এই সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে তিনি ১৯২৭ সনে Amritabazar Patrika-য় 'Hindu-Moslem Problem' নামে এই প্রবন্ধটি লেখেন। অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মিলনের আপোস করেননি তিনি যার কারণে স্ব-সমাজ থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল আবুল হুসেনকে।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হুসেন প্রত্যক্ষ করেছেন তিক্ত অভিজ্ঞতা, আর এ থেকেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন মুসলমান সমাজে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু। অতীতের মোহে অন্ধ বাঙালি মুসলমানদের চিন্তার ক্ষেত্রে মুক্তির জন্য আবুল হুসেন ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' গড়েছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সরদার আবদুস সাত্তার লেখেন, "আমাদের চিন্তাজগতে নানাদিক থেকে তা যুগান্তরের বাতাস বয়ে এনেছিল। বিশ্বাস ও চিন্তার জগতে কোনো কিছুকেই সেই সমাজকর্মীরা অলঙ্ঘনীয় অথবা অভ্রান্ত বলে মনে করেননি, মানুষকে মনে করেননি কোনো মতবাদ কিংবা ধর্মের হাতের ক্রীড়নক। ধর্মের জন্য মানুষ নয়, বরং মানুষের জন্য ধর্ম — এই সত্যকে তাঁরা উচ্চারণ করেছিলেন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে। তাই ধর্মের নিস্প্রাণ আনুষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন তাঁরা, সমালোচনা করেছিলেন মাদ্রাসা শিক্ষার ও পর্দাপ্রথার। অতীতের মোহ থেকে তাঁরা মুক্ত করতে চেয়েছিলেন সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে। হিন্দু-মুসলমানের সজ্ঞাতকে ঘৃণা করতে শিখেছিলেন তাঁরা, চেয়েছিলেন সকল প্রকার ভেদবুদ্ধি ও বৈরিতার অবসান।"[৪১]

হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানের ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে এক মিলিত জাতীয়তার স্বপ্ন ও সাধনা ছিল আবুল হুসেন তথা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র সারথিদের। 'অতীতের মোহ' প্রবন্ধে তিনি লেখেন, "মুসলমান মাওলানা রুমকে শ্রদ্ধেয় মনে করে, রবীন্দ্রনাথকেও তেমনি শ্রদ্ধেয় মনে করুক। ---- ইমাম গাজ্জালীকেও তেমনি শ্রদ্ধা করুক। তাঁরা উভয়ই মনে করুক—মানুষ খোদার সৃষ্ট জীব—মানুষের সৃষ্টি দ্বারা খোদার গৌরব বাড়ে, সেজন্য প্রত্যেক মানুষই শ্রদ্ধেয়। কৃতী মানুষ প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত আদরণীয় হোক—হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান নাম দিলে বড় জোর সে মানুষ পুষ্পের রং এর পার্থক্য দেখান হয় মাত্র। রং পুষ্পের প্রকৃত স্বরূপ নয়—তার সত্তা রং এর অন্তরে। সুতরাং বিভিন্ন ধর্ম-পরিচ্ছদ পরিহিত মানুষের আসল সত্তা তার অন্তরে—যেখানে পৃথক করবার কিছুই নাই।"[৪২] আবুল হুসেনের বহুপ্রবন্ধে তাঁর এই বিশ্বাস অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

'তরুণের সাধনা' (১৩৩৬) প্রবন্ধে তিনি লেখেন "এটা হিন্দু ওটা মুসলমান, এ-কথা শিক্ষাকেন্দ্র হতে একেবারে তুলে দিতে হবে। হিন্দুর জন্য এক স্কুল বা কলেজ, মুসলমানের জন্য আর এক স্কুল বা কলেজ বা মাদ্রাসা, এমন ব্যবস্থা নৃশংসভাবে ভেঙ্গে দিতে

Dhaka University Institutional Repository

হবে; শিক্ষা-কেন্দ্র হতে দৃঢ় হস্তে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত এই মনোভাবটি দূর করে দিতে হবে।"[৪৩] আর 'সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান' (১৩৩৪) প্রবন্ধে তিনি বলেন, "আমাদের সাহিত্যের ভিতর সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য যেন কোন প্রকারে না থাকে, তবেই মিলনের পথটি পরিষ্কার হবে।"[৪৪] অর্থাৎ তিনি আমাদের শিক্ষা ও সাহিত্যের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। আবুল হুসেন একথা উপলব্ধি করেছিলেন যে আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাই মানুষকে সাম্প্রদায়িক করে তোলে।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে সেকালে অনেকে চিন্তাভাবনা করেছেন এবং এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে উদার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ও পাওয়া যায়। শাহজাহান মনির তাঁর *বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা* গ্রন্থে লেখেন, "ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হিন্দু-মুসলমানের মিলন ব্যতিরেকে দেশের বৃহত্তর কল্যাণ আশা করা যায় না, এ কথা জোরের সঙ্গেই বলেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে, কিন্তু মুসলমান সমাজ নানা কারণে পশ্চাদৎপদ হয়ে রয়েছে। এ অবস্থায় দেশ ও সমাজের উন্নতি সম্ভব পর নয়। ---- এ সম্পর্কে ১৯২৮ সালে কলিকাতায় নিখিল মুসলিম যুবক সম্মেলনে অভিভাষণে হিন্দুদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, এই যে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার সে শুধু মুসলমানদেরই ভালোর জন্য নয়, দেশের দশের সকলের ভালোর জন্যই।"[৪৫]

আবুল হুসেন দুঃখ করে বলেন, এদেশের মুসলমানদের এ অবস্থার অন্যতম কারণ তরুণ সমাজের কর্মের প্রতি অনীহা। মুসলমানদের দোষেই ইংরেজ ও হিন্দু তাদেরকে হীন বলে মনে করছে। পিছিয়ে পড়া মুসলিম তরুণ সমাজকে উদ্দেশ করে 'তরুণ মুসলিম' (১৩৩৪) প্রবন্ধে আবুল হুসেন বলেন, "তোমরা হিন্দু ও ইংরাজকে দোষ দেওয়ার আগে নিজের চরিত্র সুন্দর কর, ব্যবহার ভদ্র কর, রুচি মার্জিত কর, প্রকৃতি নম্র কর, জ্ঞান প্রখর কর, শিক্ষা উন্নত কর।"[৪৬] আবুল হুসেন হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের মূলে উভয়ের মধ্যে ত্রুটি রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। পরস্পরের সে ত্রুটিগুলো উদার চিত্তে আবুল হুসেন ব্যাখ্যা করেছেন এবং কঠোর ভাষায় এর সমালোচনাও করেছেন। হিন্দু যুবকদের প্রতি তাঁর আহ্বান, "হে আমার বন্ধুগণ, তোমরা যেমন এদেশের মাটি হতে উদ্ভূত, তেমনই আমরাও উদ্ভূত। তোমাদের এই মাটিতে যে স্বত্ব-অধিকার, আমাদেরও তেমনি অধিকার। আজ

Dhaka University Institutional Repository

তোমরা যদি প্রাচীন হিন্দু-প্রাধান্যের স্বপ্ন দেখে মুসলমানদের অধিকারকে বিষ চক্ষে দেখ, তবে তোমাদের দেশপ্রেম সার্থক হবে না। আজ তোমাদের নব দৃষ্টিতে বাঙলার বর্তমান অধিবাসীকে দেখ্‌তে হবে। তারা এই বাঙলার পরিবেষ্টনে মানুষ হয়েছে—হিন্দু-মুসলমান একই বৃক্ষের দুইটি পুষ্পের মত একই জলবায়ু উপভোগ করে বেড়ে ওঠেছে।"[৪৭] হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বের জন্যে তিনি উভয়কে দায়ী করেছেন। উভয়ের মধ্যে সত্যিকার মিলন প্রত্যাশা করে নিরপেক্ষ ও সৎপরামর্শ স্বরূপ আবুল হুসেন লেখেন, "তোমরা যদি আজ নূতন সমাজ গড়বার জন্য বদ্ধপরিকর না হয়ে সত্যাগ্রহ করে ধর্মান্ধ সংস্কার-পীড়িত ব্যক্তির প্ররোচনায় একেবারে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে বস, তা হলে অচিরে আমরা সেই স্কট্‌ল্যান্ডের বেল্লাক্যানি বিড়ালের মত পরস্পর উদরসাৎ করে সর্বস্বান্ত হব। হিন্দু মুসলমানকে মেরে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করবে, এ ধারণা যেমন মিথ্যা, হিন্দুকে মেরে মুসলিম রাজত্বের পুনরুদ্ধার করতে হবে, সে ধারণাও তেমনি মিথ্যা। এই ধারণার বিড়ম্বনা হতে উদ্ধার পেতে হলে তোমাদের মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তোমরা প্রতিজ্ঞা কর—আমরা এ দেশের মানুষ, আমরা মানুষের কল্যাণ চাই। ধর্মের নামে অধর্মের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করছি। হিন্দু ও মুসলিম উভয়কে মিলে আমাদের সোনার বাঙলার শ্রী ফিরাতে হবে।"[৪৮] সাম্প্রদায়িক এ সমস্যার বাস্তব দিকটি আবুল হুসেন উপেক্ষা করেননি। আর এ সমস্যা সমাধানের আলোচনায় তিনি কোন সম্প্রদায় (হিন্দু-মুসলিম) কে একক্ভাবে দায়ী করেননি। নিরপেক্ষ ও প্রকৃত সত্যসন্ধ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি করে তার সমাধানের পথ নির্দেশ করে আবুল হুসেন 'আমাদের কর্তব্য কি' (১৩৩৩) প্রবন্ধে লেখেন, "আজ দেখছি চারদিকে অন্যান্য জাতির জীবনের গতি, সাধনা ও জ্ঞানার্জনে তীব্র পিপাসা। অতীত গৌরবের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য তাদের কি প্রাণপণ প্রয়াস এবং জাতীয় আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য কি অনন্যসাধারণ ত্যাগ। তারা পর্বত-প্রমাণ বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ জ্ঞান করে ক্রমাগত সম্মুখে চলেছে। ---- বিশ্বমানবের ইতিহাসে যা কিছু ভালো, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু সত্য, যা কিছু পবিত্র, সবই আপনার বুকের সামগ্রী করে তুলবার জন্য তাদের নিদ্রা, বিশ্রাম, ধন, জন সমস্তই উৎসর্গ করে দিচ্ছে। সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হব, সকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট হব, সকলের চেয়ে সুন্দর হব, সেই হয়েছে তাদের স্বপ্ন।"[৪৯] এ স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ ছিল

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হুসেনের আমৃত্যু সাধনা। আবুল হুসেনের স্বপ্নাভিসারী এ সুন্দর মনের বর্হিপ্রকাশের ঠিক উল্টো দিকে আঘাত করে ছিল রক্ষণশীল মুসলমান সমাজ। তারা ভেবেছিলেন হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় হলে মোল্লাতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনায় বিঘ্ন ঘটবে।

সবশেষে আমরা বলতে পারি যে, আবুল হুসেন ছিলেন মূলত একজন সংস্কারক। তাঁর এ সংস্কার মানসিকতার অন্তরালে মুসলমানদের সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া ও ধর্মীয় চেতনাবোধ কাজ করেছিল। যার ফলে তিনি ধর্মের প্রচলিত নিয়মগুলোর আধুনিকীরণের পরামর্শসহ মুসলমান সমাজের সামাজিক ও ধর্ম-চিন্তার অবস্থার পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন)। এতে তিনি নির্যাতিত হয়েছেন সমাজপতিদের দ্বারা, নিগৃহীত হয়েছেন স্ব-সমাজ কর্তৃক। তবুও আবুল হুসেন পিছিয়ে পড়া মুসলমান সমাজের অগ্রযাত্রায় থেমে যাননি। বলা যায় তাঁর এ ভূমিকার কারণে ধর্ম-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন মুসলমান সমাজে সুদূর প্রসারী ফল ফলেছে।

তথ্য নির্দেশ

১। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ৩-৪

২। ঐ, পৃ. ২৬-২৭

৩। ঐ, পৃ. ২৪

৪। ঐ, পৃ. ৩০-৩১

৫। ঐ, পৃ. ৩৬

৬। ঐ, পৃ. ৩৭

৭। আবুল কাসেম ফজলুল হক, সম্পাদিত *লোকায়ত*, সরদার আবদুস সাত্তার, 'চিন্তানায়ক আবুল হুসেন: ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও উত্তর কাল' ষোড়শবর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি-১৯৯৮, পৃ. ১৪-১৫

৮। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

৯। ঐ, পৃ. ৯

১০। ঐ, পৃ. ৮

১১। *লোকায়ত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩-১৪

Dhaka University Institutional Repository

১২। আবুল কাসেম ফজলুল হক, সম্পাদিত *লোকায়ত*, ষোড়শবর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর-১৯৯৮, পৃ. ৭৫

১৩। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০

১৪। ঐ, পৃ. ৬১

১৫। ঐ, পৃ. ৬১

১৬। ঐ, পৃ. ৭৩-৭৪

১৭। ঐ, পৃ. ৩৮৪

১৮। ঐ, পৃ. ৬৫

১৯। ঐ, পৃ. ৭১

২০। ওয়াকিল আহমদ সম্পাদিত, *বাঙালীর চিন্তাধারা : আধুনিক যুগ*, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণাকেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১২৫

২১। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

২২। ঐ, পৃ. ৩৮৩

২৩। ঐ, পৃ. ৩৮২-৩৮৩

২৪। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৮০-৩৮১

২৫। ঐ, পৃ. ৭০

২৬। ঐ, পৃ. ৭১

২৭। ঐ, পৃ. ৭১-৭২

২৮। মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, *জীবনীগ্রন্থমালা*-১৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৮৫

২৯। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

৩০। ঐ, পৃ. ৭৫-৭৬

৩১। ঐ, পৃ. ৩২৪-৩২৫

৩২। ঐ, পৃ. ৭৫

৩৩। আবুল ফজল, *রেখাচিত্র*, বই ঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৬৬, পৃ. ১৩২।

Dhaka University Institutional Repository

৩৪। আবুল ফজল, *শুভবুদ্ধি*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ.৯৩

৩৫। মোরশেদ শফিউল হাসান, *নির্বাচিত প্রবন্ধ আবুল হুসেন*, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৭

৩৬। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯-৪০

৩৭। ঐ, পৃ. ৩৯৯-৪০০

৩৮। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০-৪১

৩৯। ঐ, পৃ. ৪১

৪০। ঐ, পৃ. ৪২

৪১। *লোকায়ত*, ষোড়শবর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২-২৩

৪২। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

৪৩। ঐ. পৃ. ১৫৮

৪৪। ঐ, পৃ. ৩১৭

৪৫। ড. শাহজাহান মনির, *বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৭০

৪৬। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০-৫১

৪৭। ঐ, পৃ. ৫৫-৫৬

৪৮। ঐ, পৃ. ৫৯

৪৯। ঐ, পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষা-চিন্তা

'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে 'সাহিত্য সমাজে'র বার্ষিক *শিখার* ১ম বর্ষের বিবরণীতে আবুল হুসেন বলেন, "যে জাতির সাহিত্য নাই তাহার প্রাণ নাই—আবার যে জাতির প্রাণের অভাব সে জাতির ভিতর সত্যকার সাহিত্য জন্মলাভ করতে পারে না। একথাটি ভাল করে বুঝবার মত শক্তি বোধ হয় বাঙালি মুসলমানের এখনও হয় নাই। বর্তমান বাঙালি মুসলমানের সকল দৈন্যের কারণ প্রাণের অভাব, আর সে অভাবের কারণ যে সাহিত্যের অভাব সে কথা বুঝিয়ে বলবার সময় বোধ হয় আমাদের আর নাই। এই সাহিত্যের অভাব ঘুচাবার জন্য আজও আমাদের সমাজে কোন সত্যকার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে বোধ হয় না! সে অনুষ্ঠান সৃষ্টি করতে হলে সর্বাগ্রে চাই আমাদের জীবনকে সরস, সুন্দর ও বৈচিত্র বিপুল করে তোলা; আমাদের যুগ-যুগান্তরের আড়ষ্ট বুদ্ধিকে মুক্ত করে জ্ঞানের অদম্য পিপাসা লাগিয়ে দেওয়া। কিন্তু তা তো রাতারাতি হওয়া অসম্ভব।"[১] সাহিত্য সমাজের লেখকদের সাহিত্য সৃষ্টিতে মুসলমানদের শিক্ষা সম্পর্কে তাঁদের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও আদর্শ এবং মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে অবস্থা সম্পর্কে তাঁদের ধারণা প্রকাশ পেয়েছে। 'বাঙালী মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা' (১৩২৩) প্রবন্ধে আবুল হুসেন মুসলমান ছাত্রদের পাঠদান শুরুর বিষয়ে মন্তব্য করে বলেন, "সেন্‌সাস্‌ ঘেঁটে দেখি, একটি হিন্দু ছেলে ৮ বৎসর বয়সে যা আয়ত্ত করে ঠিক তাই আয়ত্ত করে একটি মুসলমান ছাত্র ১১ বৎসর বয়সে। কাজেই শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষায় মুসলমান হিন্দুর কাছে হটে যেতে বাধ্য। এর কারণ মুসলমানদের ধর্মশিক্ষার জন্য উৎকট উদ্বিগ্নতা। শিশু কথা না বলতে শিখতেই দুর্বোধ্য আরবি শব্দের সঙ্গে লড়াই করতে বাধ্য হয়। হয় পিতা না হয় শিক্ষক বেত্র হস্তে সেই আরবি শব্দ কণ্ঠস্থ করাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। ---- সেই নিষ্ঠুরতার দৌরাত্ম্যের মধ্যে মুসলমান ছাত্রের ধর্মশিক্ষা আরম্ভ হয়। অতিকষ্টে আরবি শব্দ কণ্ঠস্থ করতে করতে তার শিক্ষার প্রতি তীব্র ঘৃণার উদ্রেক হয়। সুকুমার-মতি শিশু অনেকেই এই নিষ্পেষণের চাপে একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। একদিকে তাদের সম্মুখে আরবি ভাষা

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে ওস্তাদজীর তাড়ি ও বেত্রাঘাত এই উভয় সংকটের মধ্যে মুসলমান শিশুর শিক্ষা শুরু হয়। এই জবরদস্তির ফল যে বিষময় হয়েছে সমাজপতিরা আজও তা খতিয়ে দেখছেন না - কোরান খতম করে অনেকেই শিক্ষার হাত হতে চির-বিদায়গ্রহণ করে।"[২]

আবুল হুসেন মুসলমান ছাত্রের এমন অবস্থার জন্যে আমাদের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিকেই সম্পূর্ণ দায়ী করেছেন। তিনি 'নিউ স্কিম মাদ্রাসা' সমূহের আলোচনায় বলেন যে, "একশ বছর পূর্বে হিন্দু-সমাজ সংস্কৃত শিক্ষাকে দূরে সরিয়ে পাশ্চাত্য জ্ঞানকে বরণ করেছিল - আর একশত বৎসর পরে আমরা সেই আরবি শিক্ষাকেই পুনঃপ্রবর্তিত করছি নব-প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা সমূহে। প্রাচীন শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করে যে প্রকৃত শিক্ষা হয় না, সে বুদ্ধি আজও আমাদের হয় নাই। আজ তাই আমরা প্রাচীন শাস্ত্রের সঙ্গে একটুখানি ইংরেজী জুরে দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা দিচ্ছি।"[৩] ফলে এই মাদ্রাসায় শিক্ষিত ছাত্রদের অবস্থা হয়েছে 'না ঘরকা না ঘাটকা।' এ প্রবন্ধের অন্যত্র তিনি লেখেন, "এই নব-মাদ্রাসা হতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণও তাদের সঙ্কীর্ণ-মন, স্বল্প-দৃষ্টি, আড়ষ্ট-বুদ্ধি নিয়ে মুসলমান সমাজকে জগতের অন্যান্য শক্তিমান জ্ঞান-দীপ্ত জাতির সম্মুখে নিতান্ত হেয় বলে প্রতিপন্ন করবে। নব মাদ্রাসা-শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষা ও জীবনের সঙ্গে যোগসাধন করতে পারে নাই। এরূপ শিক্ষা মনকে মুক্তি দিতে পারে না, শক্তিও বাড়াতে পারে না। আর যদি জীবনের সঙ্গে শিক্ষা খাপ না খায়, মনকে মুক্ত করতে না পারে, সে শিক্ষা জীবনকে সরস, সুন্দর করতে পারে না। যে শিক্ষা মনকে মুক্ত ও শক্তিশালী করতে পারে না সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়।"[৪] শিক্ষা সম্পর্কে আবুল হুসেন 'তরুণ মুসলিম' (১৩৩৪) প্রবন্ধে বলেন, "আমাদের অশিক্ষার চেয়ে কুশিক্ষার ফল আরো মারাত্মক। আমাদের সমাজের অতি অল্প লোকেই তা বোঝেন। ১৭৮৪ সন হতে আমাদের বাঙলার মুসলমান মাদ্রাসা শিক্ষা লাভ করে আসছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে আজ পর্যন্ত একজনও বিশ্বের জ্ঞানী বা শিক্ষিতের মজলিশে আসনগ্রহণ করার যোগ্য হননি। তাঁদের মধ্যে আজ পর্যন্ত দুই একজন অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ বা বৈজ্ঞানিক হতে পারেননি। কারণ তাঁরা পুরাতন যুগের পুঁথি কণ্ঠস্থ করেই শিক্ষিত হন; ---- সুতরাং আমাদের সমাজের চিন্তা ও কর্মধারায়ও তাঁরা কোন পরিবর্তন আনতে পারেননি।"[৫] মুসলমানদের এ অবস্থার কারণ হিসেবে আবুল হুসেন তাঁদের আড়ষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধি, পুরাতন সংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, সীমিত চিন্তা ও আধুনিক জীবন সম্পর্কে অসচেতনতাকে উন্নতির পথে বাধা বলে উল্লেখ করেন।

আবুল হুসেন প্রচলিত মাদ্রাসা-শিক্ষা-পদ্ধতিকে এর জন্যে দায়ী করে এ প্রবন্ধে লেখেন, "এতদিন ধরে হিন্দু-বাঙলা যখন বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, শিল্পী প্রভৃতি নানা গুণী সৃষ্টি করেছে, তখন মুসলিম-বাঙলা শুধু মুন্সী-মোল্লা তৈরী করেছে। দু'একজন যাঁরা কাফেরের ফতোয়া অমান্য করে ইংরেজী শিক্ষা বরণ করেছিলেন, তাঁরাই আজ মুসলিম বাঙলার মুখ রক্ষা করছেন ও তার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যুদ্ধ করছেন।"[৬] আবুল হুসেনের এ বক্তব্য আমাদের দেশে প্রচলিত মাদ্রাসা-শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আজও প্রযোজ্য। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে যাঁরা এগিয়ে ছিলেন, এদের মূল উদ্দেশ্য ছিল সরকারী চাকরি লাভ। আবুল হুসেন মনে করেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য তো শুধু চাকুরি লাভ করা নয়। শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত ব্যক্তিত্ববান হওয়া। এ ব্যক্তিত্বই মানুষকে সংস্কার থেকে মুক্ত করতে পারে।

শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের দুরাবস্থা ও দৈন্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আবুল হুসেন ১৯১২ সনে নব প্রবর্তিত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় ফারসীর স্থলে ইংরেজী এবং উর্দুর স্থলে বাংলা শেখার সুযোগ সৃষ্টিকে প্রশংসনীয় বলে মনে করেন। আবুল হুসেন লেখেন, "আজ বাঙালি মুসলমান দর্শন, বিজ্ঞান, আর্ট কোনটিতেই নাই। সম্পদ ও কল্যাণ যে পথে আসে, সে পথ তার পক্ষে রুদ্ধ হয়ে আছে। ---- আজ প্রায় দেড়শত বৎসর হতে চললো ব্রিটিশ পতাকা এদেশে উড়ছে। সেই পতাকার তলে দাঁড়িয়ে হিন্দু আজ বিশ্বজ্ঞানের অধিকারী হয়ে বিশ্ব-সম্পদ আহরণ করতে শুরু করেছে। দর্শন, বিজ্ঞান, আর্ট প্রভৃতি সমস্ত বিভাগে হিন্দু আজ প্রতিপত্তি অর্জন করে স্বদেশ, জাতি ও স্বধর্মের গৌরব বর্ধন করেছে। আর আমরা মুলসমান সমস্ত সম্পদের পথ রুদ্ধ করে অবনতির চরম সীমায় দ্রুত অগ্রসর হয়েছি। এই পার্থক্যের কারণ কি? কেন মুসলমানের এ দুর্গতি?"[৭] 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তারে শুধু সমস্যার কথাই বলেননি। শিক্ষা বিস্তারে সহায়ক দিকগুলো নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করেছেন এবং শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে এ প্রবন্ধে আবুল হুসেন লেখেন, "মানুষের জীবন বিবিধ উপকরণ দ্বারা পুষ্ট হয়। সেই সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করবার শক্তি

Dhaka University Institutional Repository

অর্জন এবং মানুষের মস্তিষ্ক, হৃদয় ও হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্পূর্ণ বিকাশ সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে শিক্ষার আবশ্যক তাতে মানুষ আপনার শক্তি প্রখর করে জগতের রহস্য অবগত হয় সমাজের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং বিশ্ব-স্রষ্টার অপরূপ শক্তিতে আস্থাবান হয়ে তাঁর দিকে ক্রমশঃ আকৃষ্ট হয় ---- ভবিষ্যতে কি তাকে হতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদয় ও মনকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করতে হবে। বুদ্ধি প্রখর হলে তার দৃষ্টি-শক্তি বাড়ে এবং হৃদয় সম্প্রসারিত হলে প্রেম ও অনুভূতি জাগে। যে শিক্ষা হৃদয় ও মনের চর্চায় বিঘ্ন ঘটায় সে শিক্ষা জাতির পক্ষে মারাত্মক । হৃদয়, মন, ইন্দ্রিয়াদির বিকাশ-সাধনের সঙ্গে ধর্ম-স্পৃহাকেও (Divine Spirit) জাগ্রত করতে হবে। তবেই মানুষের সমুদয় শক্তি প্রখর হবে। এইরূপে মানুষের অনন্ত সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে যে শিক্ষা দ্বারা, সে শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক উন্নতি ও ঐশীগুণ সাধন। এজন্য হযরত মহাম্মদ বলেছেন, 'তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ্' (খোদার গুণাবলী লাভ করতে চেষ্টা কর)। মানুষের চরম বিকাশের প্রথম পথ হচ্ছে মুক্ত-বুদ্ধি (Emancipation of Intellect) যাতে জগতের প্রয়োজন অনুসারে যুগ ধর্মের ইঙ্গিত অনুসারে স্বীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত করা সহজ হয়। অতীতের কোন যুগ বিশেষের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে যারা বর্তমানকে অস্বীকার করে তাদের বুদ্ধি মুক্ত নয়। সুতরাং তাদের শিক্ষাও অসম্পূর্ণ।"[৮]

শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য সম্পর্কে আবুল হুসেনের অভিমত হলো, মানুষের মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা সুপ্ত অবস্থায় আছে, তাকে বিকশিত করে তুলতে হবে। আর তা সম্ভব মুক্ত চিন্তাচর্চার দ্বারা খোদার গুণাবলী লাভের মাধ্যমে। তবেই মানুষের সামাজিক ও আত্মিক উন্নতি সম্ভব হবে। মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাব করে আবুল হুসেন বলেন, "হিন্দু-মুসলমানের ভিতর শিক্ষার অসমতা দূর করা এবং রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপনের জন্য একই আদর্শের শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং হিন্দু ও মুসলমানের জন্য পৃথক্ পৃথক্ প্রতিষ্ঠান না করিয়া একই স্থানে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। মাদ্রাসায় যে এক নূতন প্রণালীর শিক্ষা-বিধি প্রচলিত হইয়াছে, তাহা অবশ্য সমাজের মঙ্গলের জন্যই কল্পিত হইয়াছিল, কিন্তু কার্য্যত তাহাতে কোন ফল হইতেছে না সেই শিক্ষাই আদর্শ শিক্ষা যাহাতে

Dhaka University Institutional Repository

প্রীতি ও ঔদার্য্য বৃদ্ধি পায়, জীবন-ধারণের ক্ষমতা জন্মে এবং নূতন নতুন সঙ্কটময় অবস্থায় পড়িলে, তদনুযায়ী জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি উৎপন্ন হয়।"[৯]

ধর্মীয় সংস্কারের কারণে মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' মুসলমানের শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার কারণ হিসেবে তাদের ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অনীহাকে দায়ী করেছেন। অর্থাৎ সাহিত্য সমাজ চেয়েছে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে পশ্চাৎপদ বাঙালি তাদের আড়ষ্ট বুদ্ধিকে সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত করে শিল্প ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে আসুক।[১০] 'বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা' প্রবন্ধের উপসংহারে আবুল হুসেন লেখেন, "আজ আমাদের সকল দুর্গতির কারণ হচ্ছে আমাদের আড়ষ্ট বুদ্ধি, অন্ধ-বিশ্বাস, বর্তমান জীবন সম্বন্ধে ঔদাসীন্য এবং বর্তমান জগতের জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কহীনতা। তার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা-পদ্ধতি অনেকখানি দায়ী।"[১১]

আবুল হুসেন এর জন্য পুরাতন মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতিকে সর্বাংশে দায়ী করে বলেন, "শুধু ধর্মশাস্ত্র কণ্ঠস্থ করলেই চলে না। সঙ্গে সঙ্গে জীবন যাপনের সমুদয় কায়দা-কানুনও শিখতে হয়, হৃদয় ও মনোবৃত্তিগুলির চর্চা করতে হয়। ধর্মশাস্ত্রকে কণ্ঠস্থ করে সিকেয় তুলে রাখলে চলে না। তাকে অন্যান্য পুস্তকের সংসর্গে এনে আয়ত্ত করতে হয়, বুঝতে হয়, জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয় এবং তজ্জন্য আবশ্যক হলে কিছু কিছু ত্যাগও করতে হয়, কারণ জীবন আমাদের কাছে শাস্ত্রের চেয়ে সত্য। 'জীবন নানা শাস্ত্রকে সৃষ্টি করে—আজ আমাদের এই কথা ভাল করে বুঝে মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করতে হবে। নতুবা এ জীবন সুন্দর হবেই না, বরং ধর্ম-জীবনও আমাদের গর্হিত হতে থাকবে।"[১২] 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' শুধু শিক্ষা ব্যবস্থাকে দায়ী করেননি। পশ্চাৎবর্তী মুসলমানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে তৎকালীন সরকারের কোন রকম পদক্ষেপ গ্রহণ না করাকেও দায়ী করেছেন। ১৯২৬ সনে মুসলমানরা তাদের চেষ্টায় সা'দত কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। এর আগে মুসলমানদের পক্ষে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। আর ১৮১৭ সনে হিন্দুদের জন্যে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপন করা হয়। যার একশ' নয় বছর পর মুসলমানরা কলেজ পেয়েছে। এ অনুযায়ী মুসলমানরা হিন্দুদের চেয়ে একশত নয় বছর পিছিয়ে রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা যাকে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা বলে মনে করি, তার সীমাবদ্ধতাও আবুল হুসেনের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। 'তরুণের সাধনা' (১৩৩৬) প্রবন্ধে আবুল হুসেন তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি নির্দেশ করে লেখেন, "আজ আমরা যে শিক্ষা পাচ্ছি তাতে আমরা কেবল অপরের আজ্ঞাবহ ব্যক্তিত্বহীন নর-রূপী কতকগুলি জন্তু বৈ আর কিছুই হতে পারছি না। আমাদের অধিকাংশই চায় দাস হয়ে নিষ্ফল জীবন নিয়ে বেঁচে থাকতে। স্কুল হতে কলেজ, কলেজ হতে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত আমরা চাকরির উদ্দেশ্য নিয়েই শিক্ষালাভ করছি। ---- আমার মনে হয়, শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে—মানুষকে এই সুন্দর ভুবনে কল্যাণ, প্রেম ও সৌন্দর্যপুষ্ট জীবন যাপনে শক্তিমান ও নানা দৃষ্টিক্ষম করে তোলা। মানুষ বিশ্ব প্রভুর সৃষ্টি-ভূষণ। তাই তার জীবনে চাই সুরুচি, সৌন্দর্য, সম্পদ, প্রেম, শক্তি ও স্রষ্টাকে উপলব্ধি করবার প্রকৃষ্ট জ্ঞান। যে মানুষের জীবনে এ সমস্তের যে কোন একটির অভাব ঘটেছে সে মানুষ নামের অযোগ্য। আর যে শিক্ষা মানুষকে এ সমস্ত দিতে পারছে না সে শিক্ষা নিরর্থক।"[১৩]

তাঁর মতে, যে জাতির সকল মানুষ কিংবা অধিকাংশ মানুষ ব্যক্তিত্বপুষ্ট হয়ে শিক্ষা কেন্দ্র হতে বেড়িয়ে আসতে পারে, সে জাতির মুক্তি অবধারিত। এর জন্য প্রয়োজন জ্ঞান, সত্যপ্রীতি ও জ্বলন্ত ত্যাগ। আবুল হুসেন সমকালীন সমাজ জীবনের তিনটি অভিশাপের কথা উল্লেখ করেন, "প্রথম অভিশাপ হল : বাইরের উচ্ছৃঙ্খল আবহাওয়ায় তরুণের মস্তিষ্ক বিকৃতি ও মানসিক চাঞ্চল্য। দ্বিতীয় অভিশাপ হচ্ছে : অতীতের অন্ধ মোহ। আজকাল কি হিন্দু, কি মুসলমান, উভয়েই তাদের অতীত ইতিহাসের পানে তাকিয়ে বর্তমানের অক্ষমতা ও দৈন্যের দারুণ লজ্জাকে ঢেকে রাখছে। হিন্দু মনে করছে, প্রাচীন হিন্দু আধুনিক জগতের কিছুই হাসিল করতে বাকী রাখেনি। আবার মুসলমান মনে করছে—প্রাচীন মুসলমান সভ্যতার চরমে পৌঁছেছিল। তাই হিন্দু চাচ্ছে প্রাচীন হিন্দুত্বকে পুনর্জীবিত করতে, মুসলমান চাচ্ছে প্রাচীন ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। দুঃখের বিষয়, এ দু'জনই সাংঘাতিকরূপে বিভ্রান্ত। অতীত চিরকালই অতীত। তা আর ফিরে আসে না। অতীতের স্বপ্ন তারাই দেখে যারা বর্তমানের সমস্যা সমাধান করতে অক্ষম। ---- তৃতীয় অভিশাপ: আমাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সংস্কার, ধারণা ও তজ্জাত আমাদের ধাত।"[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

আমরা জানি, যে মানুষ আপনার শক্তিতে জাগ্রত না হয়ে নূতন সৃষ্টিকে ভয় করে চলে, সে জীবন্ত নয়, সে মৃত। আবুল হুসেন মনে করেন, বর্তমানকে গড়তে হলে কঠোর তপস্যা দরকার—সে তপস্যার প্রধান উপকরণ হলো জ্ঞানের আলোক এবং অনুভূতির অক্ষয় অর্ন্তদাহ। এ দু'য়ের সংমিশ্রণে যে প্রাণের সঞ্চার হয় তারই স্পর্শে তরুণ গলে নূতন ও শক্তিমান মানুষে পরিণত হবে। তিনি এর জন্যে শিক্ষকের পৌরহিত্যকে প্রয়োজন মনে করেছেন। আবুল হুসেন মনে করেন, স্কুল-কলেজগুলি প্রকৃত শিক্ষা কেন্দ্র করে গড়ে তোলা ও শিক্ষকগণকে প্রকৃত মুক্তির পুরোহিত করে তোলা আবশ্যক। কেননা শিক্ষক তাঁর বিপুল প্রাণ, আর অগাধ প্রেম এবং গভীর সহানুভূতি ও অপরিমেয় জ্ঞানের সবটুকু দিয়েই শিক্ষার্থীকে মানুষ করতে পারেন; শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বকে পুষ্ট করে তুলতে পারেন।[১৪] তাঁর মতে "আধুনিক জগতের বড় বড় জাতির উত্থানের মূলে শিক্ষকদের অজস্র ত্যাগ ও অক্ষয় দান মূর্ত হয়ে আছে। তাঁরাই নূতন মানুষ সৃষ্টি করেছেন—সেই নূতন মানুষই মানুষের সভ্যতাকে যুগে যুগে নূতন নূতন রূপ দিয়ে ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করেছে। কামার যেমন কাঁচা লোহা আগুনে পুড়িয়ে নূতন বস্তু তৈরী করে, শিক্ষকও তেমনি তাঁর জ্ঞান ও প্রেমের আগুনে শিক্ষার্থীকে পুড়িয়ে তাকে নূতন ব্যক্তিতে পরিণত করতে পারেন।"[১৬] এই পরিবর্তিত মানুষই হবে দেশ ও জাতির অগ্রদূত। শিক্ষকরাই এ গৌবরের দাবী করতে পারেন। এদিক থেকে আমরা আবুল হুসেনকে রামমোহন, ডিরোজিওর ভাবাদর্শের উত্তর সাধক বলতে পারি। অথচ আমাদের দেশে শিক্ষকদের যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয় না।

আবুল হুসেন মনে করতেন, ইংরেজদের এদেশে আসার কারণে এদেশের মানুষের মনে চিন্তার মুক্তি অর্জন সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। তাই তিনি তরুণদের উদ্দেশে 'তরুণের সাধনা' (১৩৩৬) প্রবন্ধে এ আহ্বান জানান, "আমি মনে করি, ভারতের সৌভাগ্য যে, ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান দীপ্ত, অতীতের মোহ-সংস্কার হতে মুক্ত ইংরাজ এদেশে প্রভুত্ব করতে এসেছে। ---- তিনি জ্ঞানকে মুক্তির উপর স্থান দিয়ে দেশবাসীকে বলেছিলেন, 'ব্রিটিশের আমলে তোমরা ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শনকে আয়ত্ত কর—অতীতের শাস্ত্র-কঙ্কালের পূজা ছেড়ে দাও। ---- কিন্তু শেষকালে ভারতের দুর্ভাগ্য যে, অতীত ও বর্তমানের দ্বন্দ্বে অতীতের জয় হয়েছে, আর আমরা 'যে তিমিরে সেই তিমিরে'ই থেকে এখনও স্বপ্ন

Dhaka University Institutional Repository

দেখছি—হয় হিন্দু-ভারত, নয় মুসলমান-ভারত। ---- তোমরা অক্লান্তচিত্তে অনন্ত জ্ঞান অর্জন কর, তোমাদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের পরিপুষ্টি ও স্ফূর্তিসাধন কর।"[১৭]

(আজ শিক্ষকদের মাধ্যমে তরুণকে বুঝাতে হবে, তার পা ও মাথা শক্ত করতে হবে, বাইরের উচ্ছৃঙ্খল আবহাওয়াকে দূর করতে হবে, তবে দেশের প্রকৃত মুক্তির পথ সহজ হবে। আবুল হুসেন এই তরুণদের উদ্দেশে লেখেন, "আমার তরুণ বন্ধুগণের নিকট আমার অনুরোধ, তারা যেন অতীতের পানে মুখ করে না থাকেন। ---- তাদের এগিয়ে চলতে হবে। গত যুগের উপর কিছু উন্নতি তাদের করতেই হবে, নতুবা তাদের জন্ম বৃথা হয়ে যাবে। অনাগত যুগকে তাদেরই সার্থক করতে হবে। তাদের বিশ্বাস করতে হবে—মানুষ অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ, আল্লাহ্ অনন্ত শক্তির প্রতিভূ! ভাঙ্গা গড়াই তার কাজ। সে ভেঙ্গে গড়তে পারে বলেই। ---- তরুণদের অসাধারণ সাহস, অমিত তেজ, অগাধ জ্ঞান, কঠোর তপস্যা চাই—যাতে তার স্থানে নূতন ধারণা-সংস্কারের ও নব-সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেওয়ার জাগ্রত শক্তি জন্মে। এই জাগ্রত শক্তিই হবে আমাদের সকল মুক্তির জন্মদাতা।"[১৮])

মুক্তি মানে মন ও আত্মার মুক্তি। মনের ও আত্মার মুক্তি লাভ করতে হলে আমাদের প্রকৃত শিক্ষা চাই, চাই সাধনা। 'মুক্তির কথা' (১৩৩৬) প্রবন্ধে আবুল হুসেন বলেন, "তার জন্য সর্বাগ্রে চাই আমাদের শিক্ষা-সংস্কার। স্কুল-কলেজে আধুনিক জগতের সাথে মোকাবিলার জন্য শক্তি অর্জনের পক্ষে যে-সমস্ত শিক্ষা দেওয়া দরকার, তার ব্যবস্থা অতি দ্রুত করতে হবে। এই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশের নানাবিধ সম্পদ বাড়িয়ে তুলবার জন্যও চেষ্টা করতে হবে। ---- আজ আমাদের সকল চেষ্টা, সকল শক্তি এই কাজে নিযুক্ত হোক।"[১৯] আবুল হুসেন মুক্তি অর্থে বুঝতেন, "মানুষ চলিষ্ণু জীব, আর চলার পথে যেটা বিঘ্ন বা বন্ধন, সেটার অতিক্রমই হচ্ছে মুক্তি—সে বিঘ্ন ছোটই হোক্ আর বড়ই হোক্। ---- জীবনের আরাম-আয়েশ দিয়ে রক্ত-মাংসের দেহ সংরক্ষণ ও তার পুষ্টিসাধন করাই মানুষের চরম চলা। দেহের ক্ষুধা নিবৃত্তি হলেই চলার উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে গেল। কাজেই এই ক্ষুধার শান্তিই হচ্ছে দেহের মুক্তি; ---- বিশেষত: আমাদের দেশের তিন-চতুর্থাংশ লোক শুধু পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তি করতেই প্রাণপাত করছে। শুধু আহার সংগ্রহ করতে যে বাধা-বিঘ্ন তাদের গতিরোধ করছে, তাতে তারা আর অন্যদিকে মন দিতে পারছে না। এই পেটের ক্ষুধা হতে

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তি লাভ করতে হলে ---- রুটির ব্যবস্থাতেই মানুষের সবল চেষ্টা নিয়োজিত হয় সর্বপ্রথম। রুটির অভাব হতে মুক্তিই হচ্ছে সবল মুক্তির ভিত্তি।"[২০]

আবুল হুসেনের মতে মুক্তি হচ্ছে, মানুষের দেহ-মন-আত্মার পূর্ণ স্ফূর্তি ও তৃপ্তি। মানুষ যখন নিজের শক্তি ব্যবহার করে কোন একটি সৃষ্টি করে তখনই তাকে চলা বলে। জীবন্ত মানুষ যে, তার গতি আছে। এ প্রসঙ্গে উক্ত প্রবন্ধের অন্যত্র তিনি লেখেন, "মানব-মনের চলার পথে কোন Full Stop নাই। এমন কোন Full Stop যদি কেউ বসিয়ে দেয়, তাকে আমরা বলব সেইখানেই তার সমাধি। মানুষ যত দিন চলতে চাইবে, তাকে Full Stop দিলে চলবে না। Full Stop অর্থে মৃত্যু। কাজেই যদি কোন মহাপুরুষের দোহাই দিয়ে কেউ সেই Full Stop দিতে চায়, তাকে মানুষের মুক্তি-অভিসারী ব্যক্তিত্বের পরম শত্রু বলে মনে করবো।"[২১] মানব জীবন চলার পথে Full Stop এর বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে চায়। আবুল হুসেনের মতে, "মানব মন বন্ধন সৃষ্টি করছে, আর সৃষ্টির মোহে মুগ্ধ-স্তব্ধ না হয়ে, সে মোহকে ছিন্ন করে আবার নূতন করে সৃষ্টি করছে। এমনি করে বার বার গড়তে আর ভাঙতে, ভাঙতে আর গড়তে যে মন দ্বিধা বা ক্লান্ত বোধ করে না, সে মন মুক্ত, আর তারই পক্ষে সম্ভব হবে জনসাধারণকে মুক্তির সন্ধান দিতে। মনের বহু দিক আজ বিকশিত হয়েছে বলে মানুষ নানা প্রকার মুক্তির জন্য ব্যগ্র হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মুক্তি (Political Emancipation), জাগতিক জীবনের প্রয়োজন অনুসারে আর্থিক ও সামাজিক মুক্তি (Civic & Economic Emancipation)। এ-সমস্তের মূলে রয়েছে মনের মুক্তি (Intellectual Emancipation)। সে মুক্তি যেখানে নাই, সেখানে অন্য কোন মুক্তির আন্দোলন জন্মলাভ করতে পারে না।"[২২] মুসলমানদের মুক্তির ইতিহাস কোন্ ধারায় চলছে, তার উদ্ধৃতি স্বরূপ আবুল হুসেন তুরস্কের কামাল পাশার নেতৃত্বে 'তুরস্কের জাতির মুক্তির আন্দোলন' প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন। এই মনের মুক্তিকেই আবুল হুসেন তথা মুসলিম সাহিত্য সমাজ 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন বলে অভিহিত করেছেন।

শিক্ষার সৃজনশীল ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করে মোতাহের হোসেন চৌধুরী তাঁর 'শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে লেখেন, "মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন না হওয়ার দরুন মুসলিম ছেলেদের পক্ষে চিন্তা ও কল্পনাচর্চা সম্ভব হচ্ছে না; অথচ এই কল্পনা ও চিন্তাচর্চা ব্যতীত শিক্ষা কখনো সার্থক হতে পারে না। কারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মনের ঘুম

Dhaka University Institutional Repository

ভাঙানো—অন্য কথায় চিন্তা ও কল্পনার উন্মেষ সাধন। বিদেশী ভাষায় শিক্ষালাভ করতে বহু সময় ও শক্তির অপচয় হয় বলে ছেলেদের কল্পনা ও মননশক্তি তেমন কার্যকর হয় না। ভাষা শিক্ষাতেই তাদের সময় যায়, ভাবচর্চা আর হয়ে ওঠে না। স্মরণ শক্তিহীন বেশির ভাগ কাজ করতে হয় বলে মননশক্তি সম্বন্ধে জাগ্রত থাকা তাদের পক্ষে মুশকিল হয়ে উঠে। তাই সংগ্রহের কাজটা যেমন চলে, নির্মাণের কাজটা তেমন চলে না; আর সংগ্রহের সঙ্গে নির্মাণ না চললে সংগ্রহ যে উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে, একথা নতুন করে প্রচার করা অনাবশ্যক।"[২৩] বাংলা মাতৃভাষা হিসেবে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করলেও বাংলা সাহিত্যকে জাতীয় সাহিত্য বলে স্বীকার করে নেওয়ার পরও মুসলমান লেখকগণ সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা করতে গিয়ে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'ই এ সব সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য এগিয়ে আসেন। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র প্রথম বার্ষিক সভায় কাজী আবদুল ওদুদ' 'বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য-সমস্যা' প্রবন্ধে বলেন, "সাহিত্য জীবনবৃক্ষের ফুল, জাতি বা সমাজ বিশেষের মগ্ন চৈতন্যের রসের যোগানে তার বিকাশ ঘটে। সেই গূঢ় রস বাংলার মুসলমান সমাজের অন্তরে সঞ্চিত আছে কি না তাদের সাহিত্য-সমস্যার আলোচনা সম্পর্কে তার সন্ধান নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় নয়। ---- সাহিত্যের বিকাশকে কতকটা তুলনা করা যেতে পারে ফুল ফোটার সঙ্গে। ফুল গাছের মূলে আমরা পরম যত্নে জল ঢাল্‌তে পারি, দেশ-বিদেশ থেকে তার জন্য ভাল সারও আন্‌তে পারি, তবু ফুল ফুট্‌বে কি না অথবা ভাল ফুল ফুট্‌বে কি না সে সম্বন্ধে যেমন হুকুম করতে পারি না, সাহিত্য সম্বন্ধেও তেমনি সমাজের ভিতরে স্কুল-কলেজ-লেবরেটরির স্থাপনা, বিচার-বিতর্কের সৌকর্য সাধন ইত্যাদির পরও পরম আগ্রহে কালের পানে চেয়ে থাকা ভিন্ন আর আমাদের কি করবার আছে।"[২৪] মুসলমান সমাজে বৃক্ষের সম্যক বিকাশ হয়নি বলে সাহিত্যচর্চা ব্যতীত সাহিত্যেরও যথার্থ বিকাশ সম্ভব হয়নি। স্বাধীন চিন্তাচর্চা না থাকলে নবচেতনা সম্ভব নয়। মুক্তবুদ্ধির চর্চাই সাহিত্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ লক্ষণ।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি, শিক্ষাই যে একটি জাতির উন্নতির প্রধান ও প্রথম অঙ্গীকার তা সর্বজন স্বীকৃত। প্রচলিত আছে যে জাতি যতটা শিক্ষিত, সে জাতি তত উন্নত। উন্নত বলতে আমরা বুঝি, নৈতিক জীবনে, ধর্মীয় জীবনে, এমনকি পার্থিব যাবতীয়

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ে উন্নতি । শিক্ষাই মানুষকে প্রকৃত উন্নত জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে। আবুল হুসেন বাঙালি মুসলমান সমাজের শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার কারণ এবং তা থেকে মুক্তির উপায়গুলো চিহ্নিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। ফলে সমাজ জীবনের বিভিন্ন অনুষঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সঠিক পথ ও পন্থা নির্মাণের জন্যে। তিনি অনুভব করেন যে, বাঙালি মুসলমান সমাজকে শিক্ষার আলোয় উজ্জীবিত করতে না পারলে শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা মুসলমানদের নিকট কোন অর্থই হবে না।)

তথ্য নির্দেশ

১। খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য সমাজ :সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১১৩

২। *আবুল হুসেন রচনাবলী* ১ম খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ১৪১-১৪২

৩। ঐ, পৃ. ১৪১

৪। ঐ, পৃ. ১৪৫-১৪৬

৫। ঐ, পৃ. ৫১-৫২

৬। ঐ, পৃ. ৫২-৫৩

৭। ঐ, পৃ. ১৩৫

৮। ঐ, পৃ. ১৪৬

৯। *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী* ৩য় খণ্ড, আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১০১

১০। *মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮

১১। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯-১৫০

১২। ঐ, পৃ. ১৪৮

১৩। ঐ, পৃ. ১৫১-১৫২

১৪। ঐ, পৃ. ১৫৬

১৫। ঐ, পৃ. ১৫২

Dhaka University Institutional Repository

১৬। ঐ, পৃ. ১৫২-১৫৩

১৭। ঐ, পৃ. ১৫৪-১৫৫

১৮। ঐ, পৃ. ১৬০

১৯। ঐ, পৃ. ১৭৫-১৭৬

২০। ঐ, পৃ. ১৬৬

২১। ঐ, পৃ. ১৭০

২২। ঐ, পৃ. ১৭৩

২৩। মোতাহের হোসেন চৌধুরী, 'শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ, *বুলবুল*, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৪১, পৃ. ৩০০

২৪। কাজী আবদুল ওদুদ, *শাশ্বত বঙ্গ*, 'বাঙালী মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা' ব্র্যাক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৩২৩

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সাহিত্য-চিন্তা

সাহিত্য ও সমালোচনা বিষয়ে আবুল হুসেন যে কয়টি প্রবন্ধ রচনা করেন—সেগুলোর অধিকাংশের পেছনে তাঁর সমাজ-সংস্কার চেতনা কাজ করেছে। *শিখার* প্রথম সংখ্যার বার্ষিক বিবরণীতে আবুল হুসেন সাহিত্য-চর্চার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন, "এই সমাজ [মুসলিম সাহিত্য সমাজ] কোনো একটা বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। কিংবা এ কোনো বিশেষ সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গঠিত হয় নাই। সাহিত্য সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য, আর সেই সাহিত্যে মুসলমানের প্রাণ ও জীবন ফুটিয়ে তোলাই এর অন্যতম উদ্দেশ্য।"[১]

আবুল হুসেন অবশ্য ছোটগল্প বিষয়ক প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন। 'ছোটগল্পের ধারা' (১৩২৬) প্রবন্ধটি তারই পরিচয় বহন করে। উক্ত প্রবন্ধটি আবুল হুসেনের ছাত্রাবস্থার রচনা এবং পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম রচনা।[২] প্রবন্ধটিতে আবুল হুসেন বাংলা ছোটগল্প রচনা সম্পর্কে একটি দিক-নির্দেশ প্রদানের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে "আমি চারিটি বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা করতেছি। জানি না, কতদূর কৃতকার্য হইব। প্রথমত : আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গল্পের ধারা কিরূপ; দ্বিতীয়ত : সাহিত্যে গল্পের আবশ্যকতা কতদূর ও কেন; তৃতীয়ত : বৈদেশিক সাহিত্যে গল্পের প্রাচুর্য ও তাহার কারণ এবং চতুর্থত : বাংলাদেশে গল্পের ধারা কিরূপ হওয়া উচিত।"[৩]

আবুল হুসেন মনে করেন , ছোটগল্প হচ্ছে সাহিত্যের পরিণত বয়সের ফল। কিন্তু বাংলা গল্প লেখকদের অসাধুতার কারণে ছোটগল্প রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য বিফল হচ্ছে বলে তিনি ধারণা পোষণ করেন। এ প্রসঙ্গে আবুল হুসেন দুঃখ করে লেখেন, "লেখক নামে পরিচিত হওয়ার বাহাদুরির লোভে বহু পুরাতন লেখকের গল্প ছাঁটকাট করিয়া ও নামধাম বদ্‌লাইয়া বেমালুম নূতন নূতন মাসিকে চালাইয়া দিতেছেন। কেহ বা ইংরেজী ম্যাগাজিনে প্রকাশিত ও ফরাসী রুশিয় ভাষা হইতে অনূদিত গল্পের অবিকল অনুবাদ নিজের বলিয়া ছাপাইতেছেন, আর পাঠক সমাজে খুব আনন্দের ও প্রশংসার রোল উঠিয়া যাইতেছে।"[৪] বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের উদ্ভব ও আবশ্যকতা সম্পর্কে আবুল হুসেনের ধারণা হলো,

Dhaka University Institutional Repository

"বাংলা সাহিত্যে গল্পের স্রোতটা অতি অসময়ে আসিয়া পড়িয়াছে, যখন মানুষ গল্প ও উপন্যাসের উপকার বা উপদেশগ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই।"[৫]

আবুল হুসেনের ধারণা, বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প লেখকদের সাহিত্যিক অপরিপূর্ণতা ও অনুকরণের কারণে বাংলা ছোটগল্প স্থায়ী সাহিত্যে স্থান পাওয়ার যোগ্যতা হারাতে বসেছে। ফলে যে উদ্দেশ্যে গল্প রচিত হচ্ছে, সামান্য পরিমাণেও সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি বলে আবুল হুসেন মনে করেছেন। এ প্রসঙ্গে আবুল হুসেন উক্ত প্রবন্ধের উপসংহারে মন্তব্য করেন, "গল্পগুলি যতদূর সম্ভব বাস্তব ও দৈনন্দিন জীবন ব্যাপার লইয়া রচিত হওয়া আবশ্যক। ---- বাস্তব ঘটনার অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া গল্প রচনা করিলে পাঠকের হৃদয়ে সাড়া জাগিয়া ওঠে ---- আত্মা সবল সজাগ হইয়া ওঠে। এই একটা মহালাভ। এই একটা উদ্দেশ্য ছোটগল্পের থাকা উচিত । ধর্মতত্ত্ব ও নীতিতত্ত্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশিষ্ট শাখা—যাহা প্রকৃত জীবনের সঙ্গে বিজড়িত—ভিত্তি করিয়া ছোটগল্প রচনা করিলে বাংলা সাহিত্য প্রকৃত সাধনার দিকে অগ্রসর হইবে।"[৬] আবুল হুসেন মনে করেন, গল্প রচনায় লেখকের উল্লিখিত বিষয়গুলোর দিকে সজাগ দৃষ্টি থাকা উচিত।

আবুল হুসেনের মতে, সাহিত্যে তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক, এক. বৈচিত্র্য ও কলা, দুই. অনুপ্রাণন, তিন. ভাবস্ফূর্তি ও ভাবকুঞ্জন । কিন্তু তিনি মনে করেন বাংলা সাহিত্যে এর কোনটিই লক্ষ্যযোগ্য নয়। বলতে গেলে বাংলা সাহিত্যে এখনও উপন্যাসের পর্যায় শেষ হয়নি। এর মধ্যেই ছোটগল্প স্থান করে নিয়েছে। ফলে সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হয়নি। এ প্রসঙ্গে আবুল হুসেন ছোটগল্পের আবশ্যকতা, উদ্দেশ্য, পাশ্চাত্য সাহিত্যে ছোটগল্পের অবস্থান, বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের বর্তমান অবস্থা ও বাংলাদেশে তার রূপ আলোচনা করেন।

আবুল হুসেনের পুস্তক সমালোচনা প্রসঙ্গে মোরশেদ শফিউল হাসান মনে করেন, যে কয়টি পুস্তকের সমালোচনা আবুল হুসেন করেছেন তাতে তাঁর সূক্ষ্ম বিচারশৈলী ও সাহিত্যবোধের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।[৭]

আবুল হুসেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের গ্রন্থ 'মতিচূর' ১ম খণ্ডের (১৩১২) আলোচনা করেন । তিনি 'মতিচূর' (১৩২৮) প্রবন্ধে বঙ্গীয় মুসলিম নারী সমাজের

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে লেখিকার মতামতকে অত্যন্ত স্পষ্ট করে তুলেছেন। তিনি বেগম রোকেয়া ও 'মতিচূর' গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, "আমাদের দুর্গতির আরম্ভ যে কোথায়, তাহাই লেখিকা তাঁহার প্রাঞ্জল, সুরুচি-সম্ভাবপূর্ণ, দৃষ্টান্তবহুল, সরল, অকপট, মাধুর্যময় রচনা দ্বারা দেখাইতে যাইয়া স্বকীয় বেদনার অনুভূতিকে ছত্রে ছত্রে ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। লেখিকা বঙ্গীয় মোসলেম নারী সমাজের আদর্শ, তাঁহার অবরুদ্ধা ভগিনীগণের দুরবস্থা দেখিয়া তাহাদিগকে জ্ঞান, শিক্ষা, নীতি, কর্ম ও স্বাধীনতায় প্রবুদ্ধ করিবার জন্য তিনি এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন।"[৮] আবুল হুসেন মনে করেন, আমাদের সমাজে পুরুষের নিদারুণ স্বার্থপরতায় নারীকে জঘন্য জীবনযাপন করতে হয় । তা-ই অতি সংযত ভাষায় লেখিকা (রোকেয়া) তাঁর 'মতিচূর' গ্রন্থটিতে তুলে ধরেছেন।

আবুল হুসেন শৈলবালা ঘোষজায়ার 'শেখ আন্দু' উপন্যাসের একটি সমালোচনামূলক নিবন্ধ রচনা করেছিলেন । 'শেখ আন্দু' (১৩২৮) প্রবন্ধে আন্দু চরিত্র সমালোচনায় আবুল হুসেন তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। গাড়ী চালক মুসলমান আন্দু কিভাবে সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে তার চরিত্র মহিমা দ্বারা চৌধুরী হিন্দু মনিব ও তার পরিবারের সকলের মন জয় করে নেয়—তার বাস্তব চিত্র এঁকেছেন লেখিকা।

আবুল হুসেনও আন্দুর মনুষ্যত্ব বিকাশে চৌধুরী পরিবারের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। আন্দু চরিত্র মাহাত্ম্য সম্পর্কে আবুল হুসেনের উক্তি, "দরিদ্র মুসলমান ভৃত্যরূপে প্রবেশ করিয়া হিন্দুর ঘরে স্নেহ সমাদরের মধ্যে পরাধীনতার বিড়ম্বনা কোনদিনই বুঝিতে পারে নাই। আন্দু সামান্য ভৃত্য হইলেও সে মানুষ ছিল ; মানুষের আত্মায় সে ভরপুর ছিল—চৌধুরী সাহেবও মনুষ্যত্বের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি ছিলেন। কাজেই মনুষ্যত্বের মহামিলন ক্ষেত্রে আন্দু ও চৌধুরী গলাগলি হইয়া দাঁড়াইয়া মানবতার প্রেমে ও সৌন্দর্যে উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া জাতি-ধর্মের সংকীর্ণতাকে উপহাস করিতেছেন।"[৯]

হিন্দু-মুসলিম মিলনে লেখিকার মনোভাবকে আবুল হুসেন উপলব্ধি করেছেন তাঁর অন্তরদৃষ্টি দিয়ে। শুধু চৌধুরী সাহেব নয়, তাঁর পরিবারের সকল সদস্য আন্দুর চরিত্র সংস্পর্শে অভিভূত হয়েছিল। চৌধুরী কন্যা ললিতা এক পর্যায়ে আন্দুকে প্রণয় নিবেদনও করে। আবুল হুসেনের ভাষায় , " সেই নিশায় নীরব কক্ষে আন্দু ললিতার প্রস্তাবে আতংকে

Dhaka University Institutional Repository

শিহরিয়া উঠিল।"[১০] আবুল হুসেনের ধারণা, চৌধুরী পরিবারে নয় সমস্ত ভাগলপুরের অলি-গলিতে শেখ আব্দুর জীবন-প্রবাহ ও চরিত্র-মাহাত্ম্য অনুভব করেছিল।

আবুল হুসেনের সাহিত্য-সাধনার প্রধান লক্ষ্য ছিল মানুষের সুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে তোলা। বাজিতপুর সাহিত্য সম্মিলনীতে প্রদত্ত বক্তৃতা 'সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান' (১৩৩৪) প্রবন্ধে আবুল হুসেনের এ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় —"আমাদের সাহিত্যের ভিতর সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য যেন কোন প্রকারে না থাকে, তবেই মিলনের পথটি পরিষ্কার হবে। শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান যেদিন এটা চাইবে সে দিন দেশের হাওয়া বদলে যাবে। সেই দিন থেকে যে নতুন সাহিত্যের সৃষ্টি হবে তা প্রকৃত বঙ্গ-সাহিত্য হবে।"[১১] উল্লিখিত বক্তব্য থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ঘোর বিরোধী ছিলেন আবুল হুসেন। তিনি মনে করতেন, হিন্দু-মুসলিম মিলনে সাহিত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাঁর মতে, সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব, হিংসা-বিদ্বেষ ও সংস্কারের প্রতি আসক্তি দুই সম্প্রদায়ের মিলনে প্রধান অন্তরায়। আবুল হুসেনের ধারণা এই অন্তরায় দূর করা সম্ভব হবে সংস্কার থেকে মুক্তি ও বিদ্বেষ মুক্ত সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে।[১২]

'সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান' (১৩৩৪) প্রবন্ধে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "বর্তমান সাহিত্যের ভিতর জাতীয় প্রেম জিনিসটির বড় অভাব। সাহিত্য-সেবী উভয় সম্প্রদায়ের লোককে দরদ দিয়ে দেখেন না। হিন্দু মুসলমানকে গালি দেয়, আর মুসলমানও তার নির্বুদ্ধিতার পরাকাষ্ঠা দেখায় হিন্দুকে আবার পাল্টা গালি দিয়ে।"[১৩] সাহিত্য-চিন্তা সম্পর্কে আবুল হুসেনের নিজের বক্তব্য এ প্রবন্ধে অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি বলেন, "বাংলা আমার মাতৃভাষা, উর্দু আমার মাতৃভাষা নয়। আমাদের একদল লোক আছেন যাঁরা উর্দুকে বাঙ্গালি মুসলমানের মাতৃভাষা বলে চালাতে চান। তাঁদের এই মূঢ়তার প্রতিবাদ করি আমি বাংলা লিখে। মুখের জোর নাই, গায়ের জোরও নাই, এজন্যই মনের কথা বাংলায় লিখে প্রকাশ করি।"[১৪] পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে আবুল হুসেন বাংলা ভাষাকে ভালবাসতেন এবং মাতৃভাষা বাংলা বলে তিনি গর্বের সঙ্গে তা স্বীকারও করতেন। মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা উর্দুকে মাতৃভাষা বলতে চান তিনি তাঁদের মূঢ়তার প্রতিবাদ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হুসেন মনে করেন, সাহিত্য অনুভূতির বিষয়। সেকালে ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর প্রীতিচর্চার আবশ্যকতা অনুভব করেছিলেন সর্ব প্রথম এবং উভয়কে মনে করেছেন, তাঁরা দু'জনই এদেশের সন্তান। এ কারণে 'সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য' (১৩৩৯) প্রবন্ধে আবুল হুসেন প্রস্তাব করেছিলেন, "সাহিত্য পরিষদ ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির মধ্যে কোন ব্যবধান থাকা উচিত নয়—উভয়ই একটা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হোক।"[১৫] এই সমিতির বৈশিষ্ট্য বা পৃথক অস্তিত্ব রক্ষা করা প্রয়োজন বলে আবুল হুসেন মনে করেন। আবুল হুসেন মুসলমান সমাজের প্রতি হিন্দু সাহিত্যিকদের উদাসীনতা লক্ষ করে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি এ ব্যাপারে তাঁদের অভিযোগ করে বলেন, "আমাদের সমাজে সাহিত্যের রুচি সৃষ্টি করার জন্য ও আমাদের বিশিষ্ট কতিপয় আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধানকল্পে আরও কিছুদিন অন্তত: এই সম্মিলনের পৃথক অস্তিত্ব রক্ষা করা দরকার।"[১৬]

'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে স্যার এ. এফ. রহমান বলেছিলেন, "মুসলিম সাহিত্য সমাজ একটা নতুন উদ্যম আমাদের সমাজের নতুন জাগরণের একটা সামান্য চিহ্ন। ---- সাহিত্য-চর্চার এই ক্ষীণ ধারাটুকু যাতে স্রোতে পরিণত হয় সেজন্য এই বার্ষিক সম্মেলনের সৃষ্টি। আপনাদের ন্যায় সাহিত্যানুরাগীদের শুভদৃষ্টি থাকলেই আমাদের সব আশা সফল হবে।"[১৭] আবুল হুসেন মনে করেন, এ আশা পূরণের একমাত্র পথ হচ্ছে সাহিত্য-চর্চা। সাহিত্য একটি সমাজ, জাতি বা দেশের জীবনপ্রাচুর্যের প্রমাণ।

আবুল হুসেন 'সাহিত্য সমাজে চিন্তাচর্চা' (১৩৩৮) শীর্ষক প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে লেখেন, "যে জাতির সাহিত্য নাই, সে জাতি মৃত। সাহিত্যের উৎস প্রাণময় জীবন। যে জাতির প্রাণ নাই, জীবনের স্পন্দন নাই, সে জাতির সাহিত্য নাই। বাঙ্গালার মুসলিম সমাজের অবস্থা মৃত জাতির অবস্থা। কোন দিকে যেন কোন সাড়া নাই, কোন স্পন্দন নাই।"[১৮] স্যার এ. এফ. রহমান ছয় বৎসর (১৩৩২) পূর্বে যে স্থানে সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে ভাষণ দিয়েছিলেন, আবুল হুসেন তার ছয় বৎসর (১৩৩৮) পর 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সাহিত্য সমাজের ছয় বছরের (১৩৩২-১৩৩৮) ইতিহাসে সার্থকতা তুলে ধরে বলেন, "ছয় বৎসর পর তারই স্থানে দাঁড়িয়ে আজ

Dhaka University Institutional Repository

আমিও তাঁর কথার সমর্থন করি। এই সাহিত্য সমাজ বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে এক নবযুগের সূচনা করেছে তাতে সন্দেহ নেই।"[১৯]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আবুল হুসেনের সাহিত্য-চিন্তার মূলেও তাঁর সমাজ-সংস্কারক মনটি কাজ করেছে এবং আধুনিক উপযোগবাদী নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও তাঁর ছিল। সমকালের বিচারে তিনি অবহেলিত হলেও আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির অগ্রযাত্রার ইতিহাসে আবুল হুসেন এখনও অনন্য ব্যক্তি।

তথ্য নির্দেশ

১। *শিখা*, বার্ষিক বিবরণী, ১ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩৩৩, পৃ.২২

২। মোহাম্মদ আবুল মজিদ, *জীবনীগ্রন্থমালা*-১৩, বা/এ, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ১৯

৩। *আবুল হুসেন রচনাবলী* ১ম খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ২৯৩

৪। ঐ, পৃ. ২৯৪

৫। ঐ, পৃ. ১৯৯

৬। ঐ, পৃ. ৩০০-৩০১

৭। মোরশেদ শফিউল হাসান, *আবুল হুসেন নির্বাচিত প্রবন্ধ*, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৩১

৮। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০২

৯। ঐ, পৃ. ৩০৬-৩০৭

১০। ঐ, পৃ. ৩০৮

১১। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৭

১২। ড. শাহজাহান মানির, *বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩৬৪-৩৬৫

১৩। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৬

১৪। ঐ, পৃ. ৩১৫

১৫। ঐ, পৃ. ৩১৮

১৬। ঐ, পৃ. ৩১৯

১৭। ঐ, পৃ. ৩২২

১৮। ঐ, পৃ. ৩২২-৩২৩

১৯। ঐ, পৃ. ৩২২

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

সংস্কৃতি-চিন্তা

'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' বাঙালি মুসলমান সমাজে জাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে যখন সংস্কৃতিচর্চার প্রয়াস চালাচ্ছিল, তখন বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল সে কাজের পরিপন্থী। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' সংস্কৃতি-চর্চাকে সামগ্রিকভাবে বাঙালি সমাজের এবং বিশেষভাবে বাঙালি মুসলমানের সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের অন্যতম প্রধান উপায় বলে মনে করতো। তাঁদের আন্দোলন শুধু ধর্মীয় সংস্কার বা সামাজিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও সক্রিয় ছিল । 'মুসলিম সাহিত্য সামজে'র এ সংস্কৃতিচর্চার প্রয়াসকে মোল্লা-মৌলভীরা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেননি। তখন বাঙালি মুসলমান সমাজের অনেক বুদ্ধিজীবীও সংস্কৃতিচর্চার বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি। খান বাহাদুর নাসিরুদ্দিন এ সময়ের সামাজিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "যে গীত রচনা করতে পারে তাকে তা করতে দেওয়া হবে না, যে গাইতে জানে তাকে গাইতে দেওয়া হবে না, যে চিত্র আঁকতে পারে তাকে চিত্র আঁকতে দেওয়া হবে না, যে অভিনয় করতে জানে তাকে সে শক্তির বিকাশ করতে দেওয়া হবে না—পদে পদে বাধা-বিপত্তি। ফল এই হয়েছে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে হাসি ও আনন্দ (এক কথায় Joide-vivre) নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এইসব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সাহিত্য-শিল্প বিকাশ অসম্ভব।"[১] 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' পশ্চাৎবর্তী মুসলমান সমাজকে যখনই শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এগিয়ে আসার জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন, তখনই তাঁরা সংস্কারপন্থী সমাজ ব্যবস্থার রোষানলের শিকার হয়েছেন। শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তা অনুভূত হয়। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অনেক নেতৃবৃন্দই এই আক্রমণ থেকে রক্ষা পাননি। যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁদের, তবু সংস্কৃতির ও সঙ্গীতের সমর্থকগণ পিছিয়ে পড়েননি। কবি কাজী নজরুল ইসলাম জোর গলায় সঙ্গীত-চর্চার সমর্থনে বলেন, "বিধি- নিষেধের মানা আমরা মানিব না। গান গাওয়াই যাহার স্বভাব, সেই গানের পাখীকে কোন অধিকারে গলা টিপিয়ে মারিতে যাইব। সুন্দরের সৃষ্টির শক্তি লইয়া যে জন্ম গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করিয়াছে, কে তাঁহার দৃষ্টিকে হেরিয়া কুফ্‌রী ফতোয়া দিবে? এই খোদার উপর খোদকারী আর যাহারা করুক আমরা করিব না। পৃথিবীর অন্য সকল মুসলমান প্রধান দেশের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম, এই ভারতেরই সকল প্রদেশে আজও যাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ গুণী—কি কণ্ঠ সংগীতে, কি যন্ত্র সংগীতে তাঁহাদের প্রায় সকলেই মুসলমান।"[২]

'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিধি নিষেধের চেয়ে বড় মনে করেছেন চিন্তার মুক্তিকে। এ প্রসঙ্গে কাজী মোতাহার হোসেনের মন্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি বলেন "সংসারে আনন্দ বৃদ্ধি করবার জন্য চিরকাল থেকে মানুষ অসীম অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করেছে এবং অনেকাংশে সফলও হয়েছে। আনন্দের উৎস হৃদয়ের প্রাচুর্য এবং তা থেকেই পৃথিবীতে নব নব সৃষ্টি হয়। তাই আজ আমরা সাহিত্য, চিত্র, সঙ্গীত প্রভৃতি লাভ করেছি। ---- যে সমাজ প্রাণ খুলে আনন্দ করতে পারে, তার মধ্যে সংকোচ, দ্বিধা বা ভীরুতার বন্ধন নেই—সে সমাজ বলবান, স্বাধীন, প্রাণময়; সে সমাজের গৃহে আনন্দের ফোয়ারা ছোটে, বাইরে প্রত্যেক কাজে তেজ ও উৎসাহ প্রকাশ পায়; তার মন সরস ও সচেতন। সেই সমাজের আনন্দ রসেই প্রতিভার জন্ম হয়। আমরা একটু চোখ মেললেই দেখ্‌তে পাই, যাদের আনন্দ আছে, তারাই জীবন্ত, তারাই পৃথিবী শাসন করছে। যাদের আনন্দ নেই, তারা ত মৃত—তাদের এ বিড়ম্বিত জীবন নিয়ে বেঁচে থাকায় লাভ কি আছে? তাই আজ প্রাণ খুলে বলতে চাই, আমরা বাঁচার মত বেঁচে থাকব—জীবনকে সার্থক করব, সুন্দর করব, উপভোগ করব, আনন্দ রসে অভিষিক্ত করব—আমরা প্রতিভার জন্ম দিব, জগতে ধন্য, বরেণ্য হয়।"[৩]

'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের এ ধারণার সাথে একমত হতে পারেননি রক্ষণশীলরা। তাঁদের মনোভাব লক্ষ্য করে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' কোন কোন ক্ষেত্রে আরবের মুসলমান খলিফাদের সঙ্গীত ও সংস্কৃতিচর্চার সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতার বিবরণ দিয়েছেন। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' সংস্কৃতিচর্চাকে কালচার বলেছেন। কালচারকে আবুল হুসেন সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে "মানুষের চিন্তা বা Idea কোন একটি বিশিষ্ট দেশে, একটা বিশিষ্ট কালে, একটা বিশিষ্ট আবহাওয়ার মধ্যে তৎকালীন মানুষকে যে সমস্ত কাজ করতে প্রণোদিত করে, সেই সমস্ত কাজের সমষ্টিই হচ্ছে 'কাল্‌চার'।"[৪] মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

কালচার সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হলো, "আরব মরুভূমি বক্ষে এক মহাপুরুষ হযরত মুহম্মদের চিন্তা বা Idea বেদুঈন- আরবকে এবং তাদের মারফতে অন্যান্য দেশের লোককে যে সমস্ত কাজ করতে উৎসাহিত করেছিল, সেই সমস্ত কাজের সমষ্টিই হচ্ছে মুসলিম কালচার। মুসলিম কালচার বলতে কোন একটি বিশিষ্ট সীমাবদ্ধ স্থানের চিরন্তন কোন কিছু বুঝলে চলবে না। ---- তাঁর সাধনা হতে যে চিন্তা জন্মেছিল তারই প্রভাবে খাঁটি আরব আবহাওয়ার ভিতর যে কাল্‌চারের সৃষ্টি হয়েছিল সেটিকে আরবী কাল্‌চার বললেই ভাল হয়। এইরূপে এই চিন্তা পারস্যের আবহাওয়ায় যে কাল্‌চারের সৃষ্টি করল সেটি পারস্য কাল্‌চার—স্পেনের আবহাওয়ায় যেটা করল সেটা মূর কাল্‌চার এবং ভারতের আবহাওয়ায় যেটা করল সেটাকে ভারতীয় মুসলিম কাল্‌চার বলতে হবে। আর এই সমস্ত দেশের কাল্‌চারকে সমষ্টি করলে 'মুসলিম কাল্‌চার' নাম সার্থক হবে।"[৫] আবুল হুসেনের মতে—এ সমস্তের মূল হচ্ছে মুসলিম কাল্‌চার। তিনি মুসলিম কাল্‌চারকে আরো সহজভাবে ব্যাখ্যা করে বলেন, "মুসলিম কাল্‌চার হল ফল আর হযরতের চিন্তাধারা হচ্ছে বীজ। সেই বীজ বিভিন্ন আবহাওয়ায় বিভিন্ন রকমের ফল প্রসব করেছে। মুসলিম কালচারের ধারা ভাল করে প্রণিধান করলে এ-কথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কাজেই ভবিষ্যতেও সে বীজ বিভিন্ন রকমের ফল প্রসব করবে, এ-কথা ইতিহাসের অর্থ মানতে গেলে আমরা বলতে বাধ্য। তা হলে আমরা কখনই মনে করতে পারব না যে, অতীতে যে মুসলিম কাল্‌চার হয়ে গেছে সেই হচ্ছে হযরতের চিন্তা ধারার অর্থাৎ ইসলামের চরম পরিণতি। এ-স্থলে আবহাওয়া কথাটিও স্পষ্ট করে বুঝা দরকার।"[৬] ইসলাম ধর্ম ও হযরত মুহম্মদ' এর প্রতি ছিল আবুল হুসেনের অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা। তিনি মনে করতেন, ইসলামের শক্তি বড় শক্তি, ইসলামের সত্য বড় সত্য। এ শক্তি ও সত্যের বলেই মুসলমান জগতে কীর্তিমান হয়ে থাকবে। আবুল হুসেন বলেন, " ইসলামের এই পরম সত্যটি যতদিন ইসলামে দীক্ষিত মানুষের অন্তরে জীবন্ত ছিল ততদিন তাঁরা তাঁদের দেহে-মনে এক অপরূপ শক্তি অনুভব করত, আর সেই শক্তির বলে তাঁরা দিগ্বিজয়ী হয়েছিল। আর যখন এই সত্যটির অর্থ তাঁরা ভুলে গেল তখনই তাদের সৃষ্টি-শক্তি ফুরিয়ে গেল—তখন হতে মুসলিম কাল্‌চারের স্রোত একেবারে রুদ্ধ হয়েছে।"[৭] তিনি মনে করেন, অতীতের কুক্ষি ঘেঁটে সময় নষ্ট করলে চলবে না। ধর্ম সম্পর্কে আমাদের নতুন করে ভাবনার বিষয় রয়েছে। আবুল হুসেনের

Dhaka University Institutional Repository

অভিমত, "আমাদের ব্যক্তিত্বের আদর্শ বড় করতে হবে। সেই আদর্শ ঠিক করে দেখতে হবে—তা হাসিল করবার পথে কি কি প্রতিকূল অবস্থা এসে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। কোন্ কোন্ বন্ধন কতখানি আমাদের পৌত্তলিক মনোভাবকে পুষ্ট করে তুলেছে, তা ভাল করে বুঝতে হবে। যদি সে বন্ধন বড় হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে ফেলে তবে সে বন্ধন নৃশংসভাবে ছিঁড়ে ফেলতে হবে। তবেই আমাদের মুক্তি। আমরা নবীন। নব-সৃষ্টি হচ্ছে আমাদের ধর্ম। অতীত আমাদের নিকট মৃত। ধর্মের সত্যকার চর্চা হচ্ছে আমাদের মনের সর্বতোমুখী বিকাশে। ---- মুসলিম কালচার এখন Static হয়ে পড়েছে। তাকে dynamic করতে হবে। মানুষের জীবন-চর্চায় কোন আদর্শ চিরন্তন, সনাতন, অপরিবর্তনীয় নয়। আল্লাহ্‌কে বড় করতে হয় নিজে বড় হয়ে। অতীতের কালচার নিয়ে তন্দ্রাহত হয়ে থাকলে আমাদের আমিত্বের অবমাননা করা হয়। আজ আমরা বিভ্রান্ত। মুসলিম কালচারের সার্থকতা হবে আমাদের পরিপুষ্ট জীবনের সার্থকতায়।"[৮]

আবুল হুসেন হযরত মুহম্মদ এর ভূমিকাকে আধুনিক ও বাস্তব সম্মতভাবে বিশ্লেষণ করে ইসলামের প্রকৃত সত্যকে সবার সামনে উন্মেচিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেন, "তিনিই প্রথম জগতের কানে এই দুনিয়া-চর্চাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে ঘোষণা করলেন। জগত স্তব্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনল। ফলে মধ্যযুগের আঁধার কেটে গেল। মানুষের মনে অনুসন্ধান প্রবৃত্তি জেগে উঠল। সত্য ও জীবন, এই দু'য়ের সমন্বয় সাধনে নানাদিক থেকে চিন্তার উৎস খুলে গেল। মানুষ আপনার মর্যাদার উপলব্ধি করল। দাসত্ব-প্রথা উঠে গেল। জ্ঞান-চর্চা শুরু হল। ---- ইসলামের নব সত্য এসে চিত্তের সঙ্কীর্ণতা দূর করে দিল। ---- বাস্তবিক যেমন আল্লাহ্‌র শক্তি আপনার অন্তরে উপলব্ধি করতে পারে সেমন কিনা করতে পারে? ---- হযরত এসে ঐ এক আল্লাহ্ জ্ঞানকে প্রখর করে তুলেছিলেন। মুসলিম কাল্‌চার এই জ্ঞান-শক্তি-প্রেম-চর্চারই যজ্ঞ।"[৯] স্থান-কাল-পাত্রভেদে হযরত মুহম্মদ এর চিন্তাধারার এরূপ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনই মুসলিম কালচার।

আমাদের সমাজের যত সংকীর্ণতা, যত কুসংস্কার ও অজ্ঞতা-এর বিরুদ্ধে ছিল আবুল হুসেনের সংগ্রাম। বর্তমানই জাগ্রত, নতুন সৃষ্টিই হবে নবীনের ধর্ম, সাধনা---এটাই ছিল আবুল হুসেনের চিন্তা ও উপলব্ধি। 'মুসলিম কাল্‌চার ও উহার দার্শনিক

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তি' (১৩৩৪) প্রবন্ধে আবুল হুসেন লেখেন, "জগতের সর্বত্র মুসলমানগণ কাফেরী ভাবাপন্ন হয়ে গেছে, ইসলাম যে সমস্ত স্থান হতে উঠে গেছে, সুখের বিষয়, ভারতের মুসলমান এখনও শরিয়তের পা বন্দ আছে। ---- ইউরোপীয় সায়েন্স দীক্ষিত মুসলমান খাঁটি মুসলমান নয়—শরীয়ত পরস্ত মুসলমানই খাঁটি মুসলমান। ---- শরীয়তে যদি ইউরোপীয় সায়েন্সের সমর্থন পুরোপুরি পাওয়া যায়, তবে রক্ষণশীল মুসলমানদের দুঃখ বা ক্ষোভের কোন কারণ থাকতে পারে না।"[১০] তিনি ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে উন্নত আদর্শের উৎকর্ষ ও বিকাশের বর্ণনা করতে গিয়ে সেখানে মুসলিম শরীয়তে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সমর্থন যাওয়া যায় বলে, রক্ষণশীল মুসলমানদের তাতে দুঃখ বা ক্ষোভের কারণ থাকাকে উচিত মনে করেননি। আর এই উৎকর্ষ ও বিকাশের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন মনের মুক্তি। চিন্তা-চর্চার মাধ্যমে মনের মুক্তি অর্জন সম্ভব। আবুল হুসেন 'মুসলিম কাল্‌চার ও উহার দার্শনিক ভিত্তি' প্রবন্ধে লেখেন, "কাজের পিছনে চিন্তা চাই। কালচার হল কর্মফলের সমষ্টি, সুতরাং কালচারের পশ্চাতে চিন্তা অনিবার্য। চিন্তাই Philosophy । Religion বলছে ঃ 'চোখ বুঝে মেনে চল'। Philosophy বলছেঃ 'চোখ খুলে চেয়ে দেখ'। একটার বাহন হল ভক্তি, অন্যটার বাহন হল জ্ঞান। জ্ঞানের প্রসূতি হল কালচার, আর ভক্তির প্রসূতি হল সন্ন্যাস বা কাল্‌চার ত্যাগ। ---- একটার ফল ক্রম-পরিণতি; অন্যটার ফল ধ্বংস। একটা মানুষকে স্বার্থমুখী' বা জগৎমুখী, আর অন্যটা তাকে জড় বা শূন্যমুখী' করে। ---- ইউরোপীয় কাল্‌চারের মূল ভিত্তি হচ্ছে Rationalism অর্থাৎ যুক্তি-পরস্ত জ্ঞান। আর তার বাহন হল Materialism অর্থাৎ মানুষ ও জগতের চর্চা।"[১১] এ Rationalism বা মনোবিকাশের মূল বাহন হল অদম্য জিজ্ঞাসা ও অতৃপ্ত সন্ধান। মুসলিম কাল্‌চারের দার্শনিক ভিত্তি সম্পর্কে আবুল হুসেন উল্লিখিত প্রবন্ধে অভিমত ব্যক্ত করে লেখেন, মুসলিম কাল্‌চারের দার্শনিক "ভিত্তিটা সনাতন নয়—মুক্তবুদ্ধি তার বাহন, আর মুক্তবুদ্ধি প্রয়োজনবশত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন লাভ করে। সে-ই পরিণতি কালে ইউরোপীয় কালচারকে জন্ম দিয়েছিল। মুসলিম কালচারের সেই দার্শনিক ভিত্তি ইউরোপীয় কালচারে পরিণত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও আমরা আজ বুদ্ধি সিকেয় তুলে রেখে আস্ফালন করছি আমরা মুসলমান। ----বুদ্ধি আমাদের জাগ্রত হয় নাই। ---- কারণ তাঁর সময়ে তিনি দেখেছিলেন মুসলমান জগৎ বুদ্ধির ঘরে তালা লাগিয়ে কেবল শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানের চলার পথে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। ---- আজকাল আমরা Text ফেলে Commentaries নিয়ে টানাটানি করছি। Text-এর আলোক যে যুগে যেমন পড়বে মানুষ তেমনি চলবে—তাতে বিঘ্ন ঘটায় টীকাকার। কাজেই টীকাকারের দোহাই ত্যাগ করে প্রকৃত মুসলিম কালচারের যে ফিল্সজফি আসল Text-এর light-এ ধরা পড়বে, সেইটার স্বাধীন প্রয়োগই হবে এখন আমাদের বর্তমান অধোগতির একমাত্র ঔষধ।"[১২] উদার ও প্রগতিশীল চিন্তাবিদ আবুল হুসেন বিশ্বাস করেছিলেন ইসলাম ধর্ম ও আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞান একে অপরের বিরোধী নয়। ইসলামেও আধুনিক বিজ্ঞানের জোড়ালো সমর্থন পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে আবুল হুসেনের চিন্তাধারা ছিল আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত এবং যুক্তি নির্ভর। তিনি বলেন, "আজ আমরা ধর্মের দোহাই দিয়ে সকল প্রকার চিন্তার স্ফূর্তিকে রুদ্ধ করতে চাচ্ছি। কিন্তু মুক্তবুদ্ধির দ্বার প্রথমে ইসলামই খুলেছিল। আবু হানিফার মত মুক্তবুদ্ধি পণ্ডিতের সংখ্যা জগতের ইতিহাসে খুব কম। ইব্নে খল্দুনের মত দার্শনিক ও ঐতিহাসিক ইউরোপীয় মুক্তবুদ্ধির নজির জুগিয়েছিল।"[১৩] ধর্মের দোহাই দিয়ে আজ আমরা সকল প্রকার চিন্তার স্ফূর্তিকে রুদ্ধ করতে চাচ্ছি। তাই ইসলাম অজ্ঞতার যুগের পরিসমাপ্তির ঘোষণা দিয়ে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্যে তৃপ্তির আয়োজন করাই ছিল তাঁদের কালচারের প্রধান উদ্দেশ্য। অথচ আমরা তারই দোহাই দিয়ে তাঁর অনুসৃত বিধি-বিধানকে চরম বলে ধরে নিয়েছি। 'ফিকা-ফোবিয়া' (১৩৩৫) প্রবন্ধে আবুল হুসেনের এ সম্পর্কে বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ প্রবন্ধে তিনি এস. ওয়াজেদ আলী প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লেখেন, "আজ আমাদের এই অধ:পতনের যুগে নূতন করে কোরান -হাদিসের ব্যাখ্যা হওয়া চাই, সেই ব্যাখ্যাই আজ আবার নূতন ফিকাহ্র সৃষ্টি করবে। প্রাথমিক যুগের প্রয়োজনের বেদনায় ফিকাহ্র সৃষ্টি হয়েছিল —এইরূপ যুগে যুগে নূতন ফিকাহ্র সৃষ্টি হবে। তবেই কোরান-হাদিস দেশ-কাল-পাত্রভেদে প্রযোজ্য হবে। কোরান-হাদিসকে যাঁরা আমাদের নিত্য প্রয়োজন সমাধান করতে কার্যকরী করেন, তাঁরাই ফকীহ্।"[১৪] এই মর্ম অনুসারে আবুল হুসেন মনে করেন, আমরা যে ব্যবস্থা করব সে হবে আমাদের নবযুগের নব ফিকাহ্। হাদিস আমাদের চলার পথের অপরিহার্য আলোক। সে আলো আমাদের পাকে ঠেলবে না, শুধু চক্ষুকে জ্যোতিষ্মান করবে। আবুল হুসেন লেখেন, "আজ আমরা কোরান-হাদিস বুকে করেই আছি, কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে ধরছি না। বুদ্ধি প্রয়োগ

Dhaka University Institutional Repository

করলেই ইজমা, কিয়াস ও ফিকাহ্‌র সার্থকতা আমরা আপনিই উপলব্ধি করব এবং দেখব যে, যুগ ধর্মের তাড়নায় উহা মুসলিমদের জন্য এক অপরিহার্য শাস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাতে কোরানের অবমাননা হবে না বরং গৌরবই বাড়বে কারণ, তাতে এই কথাই প্রমাণ হবে যে, কোরান চিরন্তন ও হযরত মুহম্মদের বাণী ও মহাজীবন সনাতন, নব নব ব্যাখ্যায় তাহা সমৃদ্ধ হয়ে মানব সমাজের চির কল্যাণ পথ উন্মুক্ত করে চলবে।"[১৫]

আবুল হুসেন কোরান-হাদিসের অবস্থানকে অস্বীকার করেননি। তিনি সমগ্র বিশ্বের মুসলমানের একমাত্র আদর্শ হযরত মুহাম্মদকে মেনে নিয়েই ইসলামের যুগোপযোগী ব্যাখ্যার কথা বলেছেন। ফিক্‌হর মূল কথা হলো কোরান-হাদিসের নির্দেশ সমাজ জীবনে যখন সরাসরি কোন সমস্যার সমাধান দিতে ব্যর্থ হবে তখন ইজমা-কিয়াসের মাধ্যমে নূতন বিধি-বিধান সৃষ্টি করা। এর নাম ফিকাহ্‌ শাস্ত্র। নূতন এবং যুক্তি নির্ভর এ ফিকাহ্‌র পরিবর্তন ও পরিবর্ধন যুগে যুগে হতে পারে। আবুল হুসেনের মতে, "আজও আমরা ঐ উপায়ে কোরান-হাদিসকে আমাদের বর্তমান অবস্থায় প্রয়োগ করে তার সার্থকতা লাভ করতে পারি। ---- সেই ফিকাহ্‌ই আজ আমাদের সমস্যা সমাধান করতে পারবে।"[১৬] ফিকাহ, ইজমা, কিয়াস কোরান-হাদিসকে মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। কোরান-হাদিস ও ফিকাহ্‌ সম্পর্কে এ প্রবন্ধের উপসংহারে আবুল হুসেন তাঁর ব্যক্তিগত মতামতকে অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন, "আমি কোন বিশেষ মতের মূঢ় নির্জীব উপাসক হতে চাই না। আমি কোরান-হাদিস-পন্থী মানুষের সমাজকে জ্ঞান-গুণ-সভ্যতার উজ্জ্বল ভূষণে ভূষিত দেখতে চাই। সুতরাং সে ভূষণ সংগ্রহ করতে হলে আমাদের বুদ্ধি ও যুক্তি উভয়ের প্রয়োগ করা প্রয়োজন। অকুতোভয়ে কোরান-হাদিস উপলক্ষ্য করে যে ফিকাহ্‌, ইজমা, কিয়াস প্রভৃতি শাস্ত্র জন্মলাভ করেছে সেসব তন্ন তন্ন করে যাচাই ও বিচার করে দেখে অবস্থা-বিশেষে ব্যবস্থা করতে হবে। ---- বলে আমার বিশ্বাস। কারণ, কোরান মানুষের প্রয়োজনকে স্বীকার করেছেন, সুতরাং সে প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য মানুষের বুদ্ধি যে ব্যবস্থা ইঙ্গিত করে তা কোরান-সম্মত হবে তাতে সন্দেহ নাই।"[১৭]

আবুল হুসেন মনে করতেন, হযরত মুহম্মদ আমাদের সাধন পথের একমাত্র আদর্শ। মুসলমানদের এ আদর্শ ও বিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ করেছিল কেহ কেহ। আবুল

Dhaka University Institutional Repository

হুসেন লেখেন, "হযরতকে কেহ কেহ অতিরঞ্জিত ভাষায় বর্ণনা করতে শুরু করলেন এবং তাঁর শত্রুও তাঁকে নানা প্রকার মিথ্যার অতিরঞ্জনে খর্ব করবার চেষ্টা করল। তৎকালীন রাষ্ট্রবিপর্যয়ও এই মিথ্যার বাড়াবাড়িকে আরও প্রশ্রয় দিতে থাকল। মিথ্যা হাদিস্ এইরূপে প্রাচীন সত্যপরায়ণ ঐতিহাসিকের বা বর্ণনাকারীর মুখে দেওয়া হতে থাকল। ইসলামের ইতিহাস এই সময়ে খানিকটা কলঙ্কিত হয়ে পড়ল। এই মিথ্যার প্রশ্রয়ের ফলে ইসলামের মধ্যে আজ নানা মতবাদ ও নানা মজহাব দেখা দিয়েছে ও দিচ্ছে। সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলে বিভিন্ন মজহাবের সৃষ্টি হচ্ছে। এটা ইসলামের অন্তর্নিহিত সত্য ও শক্তির বিষময় পরিপন্থী, তাতে সন্দেহ নাই। এক্ষেত্রে এক কোরানই ইসলামকে বাঁচাতে পারে বলে আশা করা যায়।"[১৮] এর জন্যে প্রয়োজন ইতিহাসকে সর্বপ্রকার নিছক উপাখ্যান ও বিবৃতির স্তর থেকে বিজ্ঞান ও তত্ত্বের স্তরে উন্নীত করা। শুধু ঘটনা রচনা করাই ইতিহাস নয়। ঘটনার সঙ্গে মানুষের মনের সত্য ও তত্ত্বের যোগ নির্ণয় করা ইতিহাস রচনার কাজ। তার জন্য চাই মুক্ত-বুদ্ধি, সূক্ষ্মদৃষ্টি, উদারচিত্ত, সত্যান্বেষী, সত্যানুসন্ধিৎসু, জাতি-ধর্মগত সঙ্কীর্ণতা হতে মুক্ত বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন সুনিপুণ শিল্পীর।[১৯] 'মুসলিম ইতিহাস-বিজ্ঞান' (১৩৩৪)প্রবন্ধে আবুল হুসেন প্রধানত মুসলিম ইতিহাস রচনার বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীর স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ঐতিহাসিকের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে পাঁচটি স্তরের বর্ণনা দিয়েছেন। স্তরগুলো নিম্নরূপ, "প্রথম স্তরে ইতিহাস মুখে মুখে বা স্মৃতিতে ছিল; এজন্য এই স্তর, স্মৃতি স্তর' বলে খ্যাত। দ্বিতীয় স্তরে ইতিহাসের উপকরণ সংগৃহীত হয়ে লিপিবদ্ধ হয়েছিল, এজন্য এই স্তরকে সংগ্রহ স্তর বলা হয়। তৃতীয় স্তরে সংগৃহীত ঐতিহাসিক উপকরণগুলি দেশ-কাল-পাত্রভেদে বাছাই করে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছিল, ইহাকে 'সামঞ্জস্য সাধন স্তর' বলা হয়। চতুর্থ স্তরে অর্ধ-সত্য উপকরণগুলি পরিত্যক্ত এবং সত্য উপকরণগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছিল, ইহাকে 'গঠন ও সংক্ষিপ্তকরণ স্তর' বলা হয়। পঞ্চম স্তরে উপকরণ অর্থ নির্ধারণ শুরু হয় — এজন্য এই স্তর 'তত্ত্ব-নির্ধারণ স্তর নামে খ্যাত।"[২০] তিনি প্রবন্ধের প্রথমেই ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখেন, 'ইতিহাস-বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষকে তার কাজ ও চিন্তার মধ্যে বাঁচিয়ে রাখা যায়। মানব জন্মের প্রভাত হতে মানব মনের ক্রম-বিকাশের স্তরে স্তরে তার অস্তিত্ব ও স্ফূর্তির স্মৃতিকে নিপুণভাবে যথাযথ লিপিবদ্ধ করে রাখাই ইতিহাস-

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। মানুষের সুখ-দু:খ, উত্থান-পতন, কৃতিত্বের মাহাত্ম্য এবং অকৃতিত্বের অপমান ও লজ্জা ইতিহাস-বিজ্ঞানের মাল-মসলা। এতে মানুষের বৈচিত্র্য বিপুল অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হয়, অতীত ও বর্তমানের ঘটনাবলী একসূত্রে গ্রথিত হয় এবং অতীত , বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে একটি সুরের মনোহারিত্ব ফুটে উঠে। এটা মানব বুদ্ধির একটি চমৎকার সৃষ্টি—যা দর্পণের মত মানব-প্রকৃতির সব দিকটাই ফুটিয়ে তোলে। এর দ্বারাই মানুষ আপনাকে অমর করবার চেষ্টা করে।"[২১]

আবুল হুসেন মনে করেন, স্বজাতির প্রীতির চেয়ে বিচার-বুদ্ধি ও সত্য-প্রীতি, উন্নত কল্পনা শক্তি, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি সজাগ দৃষ্টি, দার্শনিক যুক্তি, বৈজ্ঞানিক পূর্ণতা ঐতিহাসিকের আদর্শ হওয়া' উচিত। এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইতিহাস রচনা করলে মুসলিম ইতিহাস-বিজ্ঞান নিরপেক্ষ হবে। এ প্রবন্ধের উপসংহারে ইতিহাস রচনা সম্পর্কে আবুল হুসেনের যুক্তি ও প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মতে, "কোন ইতিহাসই চিরন্তন হতে পারে না। বর্তমানের ইতিহাসই জীবন্ত এবং অতীতের ইতিহাস মৃত। অতীতের ইতিহাসকে সঞ্জীবিত করতে হলে বর্তমানের মন হতে উদ্ভূত বিচার-বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি প্রয়োগ করতে হবে। ---- এ যাঁরা করতে পারেন, তাঁরাই অতীতের গৌরবকে সফল ও সার্থক করতে পারেন। নতুবা ইতিহাসের উল্লেখ কেবল আস্ফালনেই থেকে যাবে। এই তত্ত্ব-সৃষ্টির ইঙ্গিত মুসলিম ইতিহাসে সুস্পষ্ট পাওয়া যায়। ----তার ফলে যে ইতিহাস সৃষ্টি হবে, সেই ইতিহাস হতে ইসলামের নবসৃষ্টি সম্ভবপর হবে। তার পথ উন্মুক্ত করতে হলে আজ আমাদের দায়িত্বের গুরুত্ব কত কঠোর, তা উপলব্ধি করতে হবে এবং তার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। বর্তমান ও অতীতকে ভাল করে বুঝতে হবে।"[২২]

ভৌগোলিক অবস্থা ও আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে মানুষের ইতিহাস ও সভ্যতার পরিবর্তন ঘটেছে। 'ইতিহাসের ভৌগোলিক ভিত্তি' (১৩৩৪) প্রবন্ধের সূচনায় আবুল হুসেন বলতে চেয়েছেন, "ভৌগোলিক অবস্থা মানুষের ইতিহাস-সৃষ্টির মূল কারণ, ---- জগতের সর্বত্র যদি ভৌগোলিক অবস্থা একই প্রকার হত তাহলে বোধ হয় বিভিন্ন ইতিহাস বা বিভিন্ন জাতির আবির্ভাব হত না। ভৌগোলিক অবস্থা বিভিন্ন হয়েছে বলেই আজ আমরা নানা ইতিহাস দেখ্ছি, নানা জাতির সংঘর্ষ দেখ্ছি এবং সেজন্য কোন জাতিকে বাহবা দিচ্ছি আবার

Dhaka University Institutional Repository

কোন কোন জাতিকে ঘৃণা করছি। এই অহংকার ও ঘৃণা সমাধি লাভ করবে যদি আমরা স্বীকার করতে পারি যে, ভৌগোলিক অবস্থা জাতির উন্নতি ও অবনতির কারণ।"[২৩] ভৌগোলিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতির উত্থান-পতন হয়েছে। ইতিহাসের ভৌগোলিক ভিত্তি কতকগুলো অপরিবর্তনীয় ও কতকগুলো পরিবর্তনশীল উপকরণ দ্বারা গঠিত। ভৌগোলিক অবস্থার পরিবর্তনে জাতীয় চরিত্র ও ইতিহাস ধারারও পরিবর্তন ঘটে, আবহাওয়ার পরিবর্তনে সভ্যতার যেমন পরিবর্তন ঘটে তেমনি ইতিহাসও বদলে যায়। আবুল হুসেন মনে করেন, পেশা থেকে ইতিহাস জন্ম লাভ করে। পেশা অনুসারে মানুষের কার্য ও চিন্তার ধারা গঠিত হয়।

আবহাওয়ার প্রভাবের ফলে সভ্যতার পরিবর্তন যে কতখানি তা তিনি উক্ত প্রবন্ধের উপসংহারে উল্লেখ করেন, "প্রাচীন ব্যাবিলন, গ্রীস, ইটালী, মিসর, ভূ-মধ্যসাগর বেড়ে সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল। কিন্তু ভূ-মধ্যসাগর তীরে সাহারার প্রচণ্ড প্রভাব পড়ল, আর সভ্যতা পশ্চিমে সরে গিয়ে আটলান্টিক পারে আসন পাত্‌ল। আবার হয়ত আটলান্টিকের আবহাওয়া বদ্‌লে যাবে এবং প্রশান্ত মহাসাগর তীরে সভ্যতা স্থান গ্রহণ করবে। তাহলে অসভ্য চীন, জাপান, দক্ষিণ-আমেরিকা আবার সভ্য হয়ে ওঠবে। ভারতবর্ষ ও তার প্রভাবে উপকৃত হবে ও তার অতীত গৌরব লাভ করবার জন্য চেষ্টা করবে।"[২৪]

এ আলোচনা থেকে উপসংহারে আমরা বলতে পারি, আবুল হুসেন মুসলমান সমাজে সংস্কৃতিচর্চার প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। কিন্তু মোল্লা-মৌলবীরা মুসলমানদের সংস্কৃতি-চর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিরোধিতা করেছিলেন। আমাদের সমাজ থেকে যতদিন না কু-সংস্কার ও অজ্ঞতা দূর হবে, ততদিন সংস্কৃতিতে উন্নত আদর্শের বিকাশ সম্ভব হবে না। তার জন্য প্রয়োজন সর্বাগ্রে মুক্তচিন্তা।

তথ্য নির্দেশ

১। খান বাহাদুর নাসিরুদ্দিন আহমদ, *ইসলাম ও মুসলমান,* বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, পৃ. ২৬৭

২। ইমরান হোসেন, *বাঙালী মুসলিম বুদ্ধিজীবী: চিন্তা ও কর্ম,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৩৩

Dhaka University Institutional Repository

৩। খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ : সমাজ চিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ২৪৮

৪। *আবুল হুসন রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ৯৯

৫। ঐ, পৃ. ৯৯-১০০

৬। ঐ, পৃ. ১০০

৭। ঐ, পৃ. ১০১

৮। ঐ, পৃ. ১০৩

৯। ঐ, পৃ. ১০২

১০। ঐ, পৃ. ১০৪-১০৫

১১। ঐ, পৃ. ১০৬

১২। ঐ, পৃ. ১১১

১৩। ঐ, পৃ. ১১০

১৪। ঐ, পৃ. ১১৭

১৫। ঐ, পৃ. ১১৯

১৬। ঐ, পৃ. ১১৪

১৭। ঐ, পৃ. ১১৮

১৮। ঐ, পৃ. ৯৫

১৯। ঐ, পৃ. ৮৭

২০। ঐ, পৃ. ৯৩-৯৪

২১। ঐ, পৃ. ৮৫

২২। ঐ, পৃ. ৯৮

২৩। ঐ, পৃ. ৭৯

২৪। ঐ, পৃ. ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ক চিন্তা

অর্থনীতি ঃ

আবুল হুসেন তাঁর অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলোতে বাংলার মুসলমান সমাজের অর্থনৈতিক দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন। সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে সূক্ষ্ম চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর লেখার মধ্যে। আবুল হুসেন মুসলমান সমাজের সমৃদ্ধির জন্যে শুধু আইন প্রণয়নের পরিকল্পনাই করেননি, অর্থনৈতিক উন্নতির কথাও ভেবেছেন। একটি সমাজের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ অনেকাংশে নির্ভর করে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দের উপর। মুসলমানদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্যে কামাল উদ্দিন তাঁর 'অর্থনৈতিক কলহ' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, "এদেশে হিন্দু মুসলমানের বিরোধের কারণ ধর্ম বা সামাজিক বিভিন্নতা নয়—উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্যই এর প্রধান কারণ। মুসলমানের অর্থনৈতিক উন্নতি হলেই আত্মঘাতী এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসান ঘটবে।"[১] ১৯৩১ সনে *শিখার* বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে কাজী আবদুল ওদুদ অর্থনৈতিক অসমতার কথা স্বীকার করে বলেন, "চিন্তার অসমতা বিরোধের ইন্ধন যুগিয়েছে। অর্থের চাইতে চিন্তাই বেশী করে মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে।"[২] আবুল হুসেনের সমসাময়িক কোন কোন লেখকের রচনায় ভারতের মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাতে বোঝা যায় যে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। তাঁদের অনেকেই মুসলমানদের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরামর্শ দিয়েছিলেন। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর লেখকগণ এবং আরও অনেকে মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-সাহিত্যে পিছিয়ে পড়ার কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক দুরবস্থাকে চিহ্নিত করেছিলেন। মানুষের মনে মুক্তবুদ্ধির উন্মেষের জন্য যে সামাজিক পরিবেশের প্রয়োজন তা নির্ভর করে জনগণের রাজনৈতিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সামাজিক মূল্যবোধের উপর। আবুল হুসেনের মতে, তৎকালীন

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানরা এর কোনটি পায়নি। ইংরেজ শাসক ও শাসিত হিন্দু উভয়েই মুসলমানদের বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায় ভূমিকা অবতীর্ণ হয়েছিল। মূলত ইংরেজগণ কর্তৃক মুসলমানদের প্রতি উদাসীনতার কারণে মুসলমানরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়। অবশ্য মুসলমানদের এ অবস্থার জন্যে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' মুসলমানদেরকেই দায়ী করেছেন। মোতাহার হোসেন চৌধুরী 'বাঙালী মুসলমানের দৈন্য' প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে এই অবস্থার নিরসনকল্পে পরামর্শ স্বরূপ বলেন, "আর্থিক দুর্গতি দূর করতে হলে আজ আমাদিগকে সত্যিকার সৃজনমূলক আন্দোলনে হাত দিতে হবে, গ্রামে গ্রামে শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করে গ্রামবাসীদিগকে সমৃদ্ধিশালী করে তুলতে হবে, তাদের জীবনের অলসতাকে দূর করে তাদেরকে কর্মী করে গড়ে তুলতে হবে, এক কথায় তাদের অন্তরে জীবনের স্বাদ পৌঁছিয়ে দিয়ে তাদেরকে জগৎ ও জীবনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করে তুলতে হবে। জীবনের পরিপূর্ণ আস্বাদ পাইনি বলেই, আজ আমরা শ্রম-বিমুখ, অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা নব নব বৈভব সৃষ্টি করতে অক্ষম। তাই নিজের পতনে নিজের দোষ না দেখে অন্য সমাজের কারসাজি দেখি, আর সেজন্য তাকে গালি দিয়েই সমাজের প্রতি নিজেদের কর্তব্য সমাপন করি। কিন্তু আজ আমাদের মনে রাখতে হবে, মুসলমানের উন্নতি ইংরাজের নিকট পেশ অথবা হিন্দুর প্রতি ঈর্ষা পোষণের মধ্যে নেই, আছে সমাজের জন্য মুসলমানেরই সত্যিকার পরিশ্রমের মধ্যে।"[৩] কর্মক্ষেত্রের সম্প্রসারণকে বাঙালি মুসলমানের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে চিহ্নিত করে মোতাহার হোসেন চৌধুরী দেশে যথেষ্ট কলকারখানা গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করে 'মধ্যশিক্ষা ও অর্থকরী বিদ্যা' নামক অপর প্রবন্ধে লেখেন, "দেশের বুকে শত শত কলকারখানা স্থাপনের ভিতর দিয়া যাহাতে অসংখ্য কর্মের সৃষ্টি করা যায়, সেই দিকেই যেন আমাদের সবল ইচ্ছা ও উদ্যম ধাবিত হয়। কর্মের সৃষ্টি হইলে কর্মী আপনা হইতেই দেখা দিবে, কর্মীর সৃষ্টি হইলে কর্ম না-ও দেখা দিতে পারে। ---- কলকারখানা বা ফ্যাক্টরী স্থাপনে কোন রাষ্ট্রিক অসুবিধা আছে কি না জানি না। রাষ্ট্রের কৃপা ব্যতীত কখনো আর্থিক সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। যে প্রকারেই হোক, রাষ্ট্রের কৃপা-দৃষ্টি আমাদের লাভ করিতেই হইবে। নইলে মুশকিল আসান অসম্ভব।"[৪] মুসলমান সমাজের

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক মুক্তির কথা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'ই প্রথম ভেবেছেন এবং সমাধানের জন্যে পথ নিদের্শ করেছেন।

আবুল হুসেন ছাত্রাবস্থায়ই আধুনিক অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিচিত হন। পরবর্তী সময়ে বিশ্বদ্যিালয়ে অর্থনীতির শিক্ষক হওয়ার পর দেশ ও জাতির উন্নতিতে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি লক্ষ্য করে দেশে কলকারখানা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তিনি আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার খারাপ দিকগুলো সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তবুও আশাবাদ ব্যক্ত করে আবুল হুসেন তাঁর 'ইন্ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম-যন্ত্রশিল্প প্রবাহ বা কলের কারখানা' (১৩৩৮) প্রবন্ধে লেখেন, "আমি যে ইন্ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম সম্বন্ধে বলিতে ইচ্ছা করিতেছি তাহার জন্মভূমি সাগর বেষ্টিত ইংল্যান্ড ভূমি এবং খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহার সূত্রপাত হইয়াছে। ঠিক এই সময় কতকগুলি কারণের একত্র সমাবেশ হওয়ায় এই ইন্ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌মের আবির্ভাব অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল।"[৫] ইন্ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌মের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব এ ভাবনা আবুল হুসেনের অযৌক্তিক ছিল না। তিনি 'ইন্ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম-যন্ত্রশিল্প প্রবাহ বা কলের কারখানা' প্রবন্ধে এর 'আবির্ভাব' স্ফূর্তি, প্রভাব ও পরিণাম দেখিয়াছেন। ইন্ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম বা যন্ত্রশিল্প প্রবাহকে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র কোন কোন লেখক সমর্থন করেননি। তাঁরা মনে করেন, আমাদের দেশের কৃষক সমাজের অর্থনৈতিক অবনতির কারণ হচ্ছে এই ইন্ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম। আবুল হুসেন এই ইন্ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌মের পরিণতি সম্পর্কে লেখেন, "ইন্ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌মের পরিণতি যে আজ মানবের আত্মার পক্ষে স্বাস্থ্যকর ও কল্যাণকর নয় তাহা আমাদের সাধক কবি ও ঋষি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অরবিন্দ একদিকে অন্তর দৃষ্টির বলে, অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধী স্বীয় কর্মবুদ্ধি ও প্রজ্ঞার সাহায্যে ঘোষণা করিয়াছেন।"[৬] আবুল হুসেন লক্ষ্য করেছিলেন যে, ইন্ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম সে সময় সমগ্র বিশ্বে এক বিচিত্র মরীচিকাময় জালের সৃষ্টি করেছিল। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ এই মহিমাময় জালে আটকে পড়েছিল। আবুল হুসেন মনে করেন, এই ইন্ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম শুধু ভারতের জন্যে নয়, পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের জন্যে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেছে। 'ইন্ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম-যন্ত্রশিল্প প্রবাহ বা কলের কারখানা'র (১৩২৮) বিকাশকে তিনি দায়ী করে লেখেন, "ইন্ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম বিকাশ লাভ করিয়া কৃতী হইয়াছে যতদূর, তদপেক্ষা মানবের

Dhaka University Institutional Repository

অবনতি হইয়াছে অধিক। আধুনিক জগতের মানবের দুর্গতি ও দুরবস্থার জন্য ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম পুরামাত্রায় দায়ী।"[৭] তাঁর ধারণা, এই ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম সমাজের প্রতিটি স্তরে অবনতি অশান্তি ও অনাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'মানুষ কেবল একটি রক্ত-মাংস-অস্থির সমষ্টি মাত্র নহে। ---- মানুষের অস্থি-মাংসের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী অন্তর মানুষ আছে। তাহাকে উপেক্ষা করিয়া যাওয়ায় ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম মরণের পথ খুলিয়া বসিয়াছি। অন্তর-মানুষের মধ্যে যে অন্তঃকরণ আছে তাহার কোন স্ফূর্তি লাভের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, তাহাকে সজোরে চাপিয়া মারিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম। ---- বর্তমান জগতে ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌মের যুগে 'মালিক' শ্রমী'র অন্তর-মানুষটিকে কলের মধ্যে লইয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু আজ সেই অন্তর-মানুষটির উপরে উঠিবার প্রয়াস ঐ Socialism, Collectivism I Bolshevism - এ প্রকাশ।"[৮] আবুল হুসেনের মতে এই বলশেভিজম নব ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াজ্‌মের প্রতিক্রিয়া, যারফলে জন্ম নেবে নব ইনডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম।

যান্ত্রিক সভ্যতায় ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম এর প্রভাব সম্পর্কে আবুল হুসেন সচেতন ছিলেন। এর প্রভাবে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি ও তাদের মধ্যে কিরূপ ফল প্রসব করবে তাও আবুল হুসেনের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তিনি মনে করেন, উৎপাদক শ্রেণী, ব্যবহারক ও ভক্ষক শ্রেণী, এবং শ্রমী শ্রেণী এ শ্রেণী বিভক্তির কারণে ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম ব্যবহৃত হবে। তবুও এর কল্যাণমুখিতা সম্বন্ধে আবুল হুসেনের বিশ্বাস ছিল প্রবল। তিনি মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "বিভিন্ন অসমান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া মন্থন করিতে গিয়া ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম যে Bolshevism-রূপ এক ভয়াবহ ফল প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা অমৃত কি গরল—ইহা দেখিবার ভার ভবিষ্যৎ সমাজের উপর রহিল। ---- তবে এটুকু বুঝা যাইতেছে যে, মানবের আত্মার মুক্তি হইতেছে ভবিষ্যৎ সমাজের লক্ষ্য ও সাধনা।"[৯] আবুল হুসেনের ধারণা ছিল ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম এর নতুন সংস্করণ শ্রেণী বৈষম্য দূর করবে। শুধু অর্থোপার্জন এবং সভ্যতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বর্ধিত করাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, তা নব ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম মেনে চলবে। তবেই শ্রমিক-মালিককে এক আসনে বসাবে।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হুসেন তাঁর প্রবন্ধে মুসলমান সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতির কথাই শুধু বলেননি, সমগ্র ভারতের অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেছেন। 'ফ্রেড্রিক লিষ্ট ও তৎকালীন জার্মানী' (১৩২৭) প্রবন্ধে তিনি ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনের জন্যে সকল প্রকার কলকারখানা ও শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব করে আবুল হুসেন লেখেন, "অর্থনীতিক স্বাধীনতা ফিরাইতে হইলে আচ্ছাদনের জন্য যত প্রকার শিল্প সম্ভবপর, সমস্তই ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। ঈদৃশ অর্থনীতিক দাসত্ব জাতির প্রাণহীনতার পরিচায়ক।"[১০] একটা জাতির যত প্রকার উৎপাদন শক্তি আছে তার মধ্যে শিল্প হচ্ছে সর্বপ্রধান। শিল্প স্থাপন জাতির নৈতিক ও আর্থিক শক্তিকে প্রখর করে তোলে। এ সত্য আবুল হুসেন উপলব্ধি করেছিলেন ছাত্র জীবনেই।

'ফ্রেড্রিক লিষ্ট ও তৎকালীন জার্মানী' (১৩২৭) এবং 'ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম যন্ত্রশিল্প প্রবাহ বা কলের কারখানা' (১৩২৮) প্রবন্ধ দু'টি আবুল হুসেনের ছাত্র জীবনের রচনা। ফ্রেড্রিক লিষ্টের জীবন আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, " National System– এর প্রভাবে 'পুরাতন জার্মানী' কতদূর অভিনব জার্মানী হওয়ার দিকে অগ্রসর হইয়াছিল তাহা লক্ষ্য করিবার সময় আমাদের সোনার ভারতের দুঃখ-দৈন্য-দুর্ভিক্ষ পীড়িত বর্তমান অবস্থার কথা মনে হয়। ---- ১৮০০ অব্দের জার্মানী যেরূপ ইকনমিক দুরবস্থার পড়িয়া দেশ ও জাতি হিসাবে নিজের অস্তিত্ব হারাইতে বসিয়াছিল, তদ্রূপ এমন কি তদপেক্ষা অধিকতর দুরবস্থা ও দুর্দিনের মধ্যে ভারত আজ নিজের জীবন টানিয়া চলিয়াছে। ধন্য ভারতের ধৈর্য। 'লিষ্ট' সেই দূর দৃষ্টের সময় নিজের পূর্ণশক্তি নিয়োগ করিয়া জার্মানীর জাতিত্ব ও স্বাধীন স্ফূর্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।"[১১] অর্থাৎ লিষ্টের মতো আবুল হুসেনও মুসলমান সমাজের দুর্দিনে নিজের পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করে মুসলমানদের জাতিত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি মুসলমান সমাজের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য দৃঢ় সংকল্প ও দেশের মানুষকে বৃহৎ মানুষে পরিণত করার জন্য সতত উপায় উদ্ভাবনশীল ছিলেন। কিন্তু তিনি স্বাধীন মত প্রচারে বাধা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, হয়েছিলেন নির্যাতনের স্বীকার। তাঁর সকল প্রয়াস নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল রক্ষণশীলদের রোষাণলে। আত্ম-মর্যাদা ক্ষুন্ন হওয়ায় আবুল হুসেন এক সময় ঢাকা থেকে কলকাতায় চলে যান। তবুও এদেশের মুসলমানদের প্রতি থেকে যায়

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হুসেনের অপরিসীম হৃদয়ের টান। তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নের উক্তিগুলোর মধ্যে "আসিবে কি সেদিন যেদিন দেখিতে পাইব—ভারতে 'ষোলভারেণ, সৃষ্টি হইয়াছে, বৈদেশিকেরা শোভ যাত্রা করিয়া ভারতের উপকূল ত্যাগ করিতেছে, দেশের শিল্পী বণিকেরা সমগ্র ভারত শিল্প-বাণিজ্য সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, অন্তর-শিল্প-বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের স্ফূর্তি সাধনার্থে একমত হইয়া বৈদেশিক দ্রব্যের উপর শুল্ক চাপাইয়াছে—আত্মতুষ্টির জন্য আর পর-মুখাপেক্ষী হইতেছে না।"[১২]

বিংশ শতকের প্রথমার্ধের সমাজ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সেখানে মুসলমান তথা ভারতবাসীর অর্থনৈতিক অনুন্নতির প্রধান কারণ ছিল শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে শাসকদের উদারনীতির অভাব। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী তৎকালীন মুসলমান সমাজের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণ হিসেবে মুসলমানদের বাণিজ্যের প্রতি অমনযোগ ও উদাসীনতাকে দায়ী করে বলেন, "বর্তমান মুসলমান সমাজ, ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে বিশেষ মনোযোগী নহে। তাহারা অধিকাংশ লাভজনক ব্যবসা হাত ছাড়া করিয়া অমুসলমানদিগের একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে। জাতিগত হিসাবে ইহা অত্যন্ত সাংঘাতিক ব্যাপার।"[১৩] আবুল হুসেন মনে করেন, উদারনীতি প্রয়োগের ফলে বল্কারখানা শিল্প-প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তবেই ভারত অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকে মুক্তি পাবে। যে দেশ যত বেশী শিল্প ও বাণিজ্যে সমৃদ্ধি লাভ করবে সে দেশ তত বেশী উন্নত হবে।

'শিল্প-বাণিজ্যে অভারতীয় মুসলমান' (১৩৩৫) প্রবন্ধে ঐতিহাসিক ইব্নে খল্দুনের সম্পর্কে আবুল হুসেনের বক্তব্য হলো, "জগতের বিভিন্ন জাতির পার্থক্য ও চরিত্রগত বৈসাদৃশ্যের কারণ-সমূহের মধ্যে 'আর্থিক অবস্থা' অন্যতম। কিন্তু আর্থিক অবস্থা কোথায় কিরূপ ছিল ও কেন তদ্রূপ অবস্থা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে কিছুই তিনি লিখে যান নাই। এ জন্য আমরা প্রাথমিক মুসলিম জাতির আর্থিক অবস্থার ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে খাড়া করিতে পারি না—যদিও মুসলিম বাণিজ্য ও শিল্পের উত্থান ও উন্নতি কিয়ৎকালের জন্য জগতকে স্তম্ভিত ও ঐশ্চর্যমণ্ডিত করেছিল।"[১৪] ভারতের বাইরে আরববাসী মুসলমানরা শিল্প-বাণিজ্যে গৌরবজনক উন্নতি লাভ করেছিল। আবুল হুসেন উক্ত প্রবন্ধে প্রাক ইসলাম যুগের অভারতীয় মুসলমানের বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য ও আরব দেশসমূহ মক্কা, উমাইয়া খলিফা, দামেশ্ক ও আব্বাসীয় খলিফাদের বিলাসভূমি বাগদাদের আর্থিক উন্নতি উল্লেখ করে

Dhaka University Institutional Repository

কর্দোভার ঐশ্বর্য সম্পর্কে আলোচনা উক্ত প্রবন্ধের ব্যপ্তি লাভ করেছে। প্রবন্ধটি *সওগাত* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ৫টি সংখ্যায় ৫টি অংশে প্রকাশিত হয় বলে *আবুল হুসেন রচনাবলীতে* উল্লেখ রয়েছে। এর প্রথম অংশে প্রাক আরব দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, রফতানি আমদানীযোগ্য দ্রব্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাদি তুলে ধরা হয়েছে এবং হযরত মুহম্মদ এর জন্মগ্রহণ ও কোরেশ বংশের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশের (১৩৩৫ সন, জৈষ্ঠ্য, ৫ম বর্ষ. ১২শ সংখ্যা, *সওগাত*) প্রথমে আবুল হুসেন লেখেন, "অন্ধকারে নিমজ্জিত দস্যু-তস্কর-প্রধান জগতের মধ্যে মরুভূমির বিরাট পুরুষ মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন। তাঁর অমর বাণী চতুর্দিকে বিঘোষিত হ'ল—শিল্প-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবনের কথা জোর গলায় প্রচারিত হলো।"[১৫] এতে ব্যবসা-বাণিজ্যে ইসলামী নীতি, ইসলামী আদর্শ, ব্যবসায়ে লেনদেন, সুদ গ্রহণ ও বর্জন সম্বন্ধে কোরানে বর্ণিত নীতি ও হযরত মুহম্মদ ব্যবসায়ে যে নীতি অনুসরণ করেছেন সে বিষয়াদি আলোচনা করে দামেশ্কের শিল্প-নৈপুণ্যে খ্যাতি লাভ করার ইতিহাস তুলে ধরেছেন। হযরত মুহম্মদ বাণিজ্যকে খোদার প্রিয় বলে ঘোষণা করেছেন। আবুল হুসেন আরববাসী মুসলমানদের আর্থিক ও সামাজিক অধ:পতন দেখে তাদের আর্থিক ও সামাজিক মুক্তির জন্যে প্রথমে মুসলমানদের অর্থনৈতিক উন্নতি কল্পে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর জোড় দিয়েছেন।

বাগদাদে মুসলমানদের নতুন রাজধানী স্থাপন আব্বাসীয় খলিফাদের অমর কীর্তি। কর্দোভার উত্থান আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের পথপ্রদর্শক। 'আব্বাসীয় যুগের ব্যবসা-বাণিজ্য'—এ প্রবন্ধের তৃতীয় (৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩৫ সন) অংশে বিধৃত হয়েছে। চতুর্থ-পঞ্চম (৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৩৫ ও ৫ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ সন) অংশে স্পেনের (মূর) মুসলমানদের ব্যবসা-বাণিজ্য ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লবের ভিত্তিভূমি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ৫ম অংশের উপসংহারে আবুল হুসেন বলেন, "মুসলিম সাম্রাজ্যে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে যে বিপ্লব ঘটেছিল এবং সেই বিপ্লবের ফলে যে বাণিজ্য ও শিল্প-জ্ঞান উন্নতি লাভ করেছিল তারই উপর আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দুঃখের বিষয়, মুসলিম অর্থনীতির ইতিহাস পুরাপুরি আমাদের হস্তগত হয় নাই।"[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

উপরের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আবুল হুসেন এদেশের মুসলমানদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পিছিয়ে পড়ার কারণগুলো উল্লেখ করেন এবং অমুসলিমদের অর্থনীতিতে উন্নয়নের বিভিন্ন দিকের প্রসঙ্গ এনে মুসলমানদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনয়নের পথগুলো উত্থাপন করেছিলেন।

রাজনীতি ঃ

বিশ শতকের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক কর্মধারার প্রতিফলন বাঙালি মুসলমান লেখকদের সাহিত্যচিন্তায় ও কর্মে লক্ষ করা যায়। এ সময়ে বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা পরিচালিত বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন-বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই আন্দোলনের মূল বাণী ছিল কোরান ও হাদিস পরিপন্থী আচার-অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করে বিশুদ্ধ ইসলামে প্রত্যাবর্তন। এই আন্দোলনের ফলে মুসলমানদের মনে প্রচণ্ড ব্রিটিশ বিরোধী চেতনা সৃষ্টি হয়েছিল। রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য এই সময় ছিল সবচেয়ে দুঃসময়। এই আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণ যোগদান করেছিল। কিন্তু ইংরেজদের আক্রোশ মুসলমানদের উপর বেশী পড়েছিল। তাঁরা সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করেন। স্বাভাবিকভাবেই এ অবস্থার প্রভাব থেকে মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা দূরে থাকতে পারেননি। রাজনৈতিক এ জটিলতার মধ্যে প্রবেশের ইচ্ছা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র লেখকদের ছিল না। কিন্তু বাঙালি মুসলমান সমাজে জাগরণ আনার জন্যে মুসলিম লেখকগণ রাজনীতিকে সম্পূর্ণ পরিহার করতে পারেননি। এ মনোভাব থেকেই আবুল হুসেন ১৯৩১ সনে 'আমাদের রাজনীতি' (১৩৩৭) নামক প্রবন্ধ রচনা করেন। এ প্রবন্ধের পটভূমি আলোচনা করতে গিয়ে, আবদুল কাদির লেখেন, "'আমাদের রাজনীতি' প্রবন্ধ রচনার সময় থেকেই তিনি প্রকাশ্যে রাজনীতি-চর্চা শুরু করেন। তৎপূর্বে তিনি *দি মুসলমান, মুসলিম ষ্ট্যান্ডার্ড* প্রভৃতি ইংরেজী পত্রিকায় 'ইবনে মুসা' ছদ্মনামে দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ও গঠনতান্ত্রিক সমস্যাদি নিয়ে বহু পত্র ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন । ১৯৩২-৩৩ সনে তিনি যশোহর জেলাবোর্ডের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সৈয়দ নওশের আলী সাহেবের দলের মনোনীত এক প্রার্থী ছিলেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। সেই নির্বাচন-দ্বন্দ্বে আবুল হুসেনের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষীয় কর্মীরা নাকি প্রধান

Dhaka University Institutional Repository

হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করেন *মোহাম্মদী* বিবিধ পত্রিকার বিরূপ উদ্ধৃতিসমূহ। ফলে ধর্মভীরু ভোটদাতাদের সমর্থন লাভে বঞ্চিত হয়ে আবুল হুসেন পরাজয় বরণ করেন।"[১৭] 'সাহিত্য সমাজে'র পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে 'আমাদের রাজনীতি' প্রবন্ধটি পাঠের পূর্বে এর রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আবুল হুসেন বলেন, "আমাদের রাজনীতি' বলতে বুঝতে হবে—ভারতের কোলে যাঁরা জন্মেছেন বা আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের রাজনীতি।"[১৮] আমাদের রাজনীতি বলতে অনেকেই মনে করতে পারেন মুসলমানের রাজনীতি অথবা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র। আবুল হুসেন দুঃখ করে বলেন, ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভারতবাসীরা ভারতীয় রাষ্ট্র বলে কোনে আদর্শকে দেখতে চাচ্ছেন না। তিনি তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে লেখেন, "রাজনীতির প্রয়োজন রাষ্ট্রগঠন, সংরক্ষণ ও পরিচালনার জন্য; আর রাষ্ট্র গঠিত হয় বিশিষ্ট ভৌগোলিক আবেষ্টন-লালিত দেশ ও তার অধিবাসীদের অবিচ্ছেদ্য সংযোগে। বর্তমান ভারতবর্ষ ও তার অধিবাসীদের অবিচ্ছেদ্য যোগে যে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে তার সংরক্ষণ ও পরিচালনার জন্য যে নীতির প্রয়োজন তাই হবে 'আমাদের রাজনীতি'। একই ভৌগোলিক পরিপার্শ্ব-পুষ্ট ভূ-ভাগের অধিবাসীদের বিভিন্ন ধর্মের পোষাক পরিয়ে পৃথক পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র গঠন করা যায় কি না; একই রাষ্ট্রের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ গঠিত হতে পারে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র হতে পারে কি না; এ সব ভাবনার বিষয়।"[১৯] আবুল হুসেন অন্তরে যে সত্যকে গ্রহণ করেছিলেন তাহলো, মানুষের বৃহত্তর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করতে হলে সুপরিচালিত রাষ্ট্রের প্রয়োজন এবং রাষ্ট্রকে ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল করতে হলে প্রয়োজন সুচিন্তিত রাজনীতির। তিনি এও লক্ষ্য করেছিলেন যে, তৎকালীন ভারতে ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় ছিল তৎপর। তাই উভয় সম্প্রদায়ের এই পদক্ষেপকে স্ব-স্ব সমাজের জন্য ভুল মনে করে তিনি এই নীতির সমালোচনা করেছিলেন। আবুল হুসেন মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য-নীতিকে সমর্থন করেননি এবং একে একটি দেশের বৃহত্তর কল্যাণের পরিপন্থী সংকীর্ণ নীতি বলে মনে করতেন। তিনি স্বাতন্ত্র্য-নীতির বিরোধিতা করে লেখেন, "আজ স্বাতন্ত্র্য-নীতি যাঁরা দাবী করছেন তাঁরা দেশের বৃহত্তর কল্যাণ ও তার আয়োজনের ধারণা করতেও অসমর্থ। দেশের লোকের ব্যক্তিত্ব বিকশিত করবার জন্য যে রাজনীতির প্রয়োজন তার মূলনীতি হচ্ছে গণতন্ত্র (democracy)—ভারতবাসী তার নিজের

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন নিজেই নির্ধারণ করবার ক্ষমতা চায়। ----স্বাতন্ত্র্য-নীতির ফলে উভয় সম্প্রদায়ের নেতারগণ মিলে কখনও একযোগে বৃহত্তর কল্যাণের দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে পারবেন না। একে অপরকে সন্দেহ করবেন, এবের প্রস্তাবে অন্যে প্রমাদ গণবেন। তা'ছাড়া, স্বরাজ (Responsible Govt.) কখনও কার্যকরি হবে না।"[২০] তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সংখ্যায় গুরু হলেই মানুষের শক্তি বাড়ে না। শক্তি বাড়ে — বুদ্ধি, চরিত্র ও জ্ঞানে। আবুল হুসেন হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ নিরসনের জন্যে মিশ্র নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এ প্রবন্ধের অন্যত্র লেখেন, "মুসলমান নেতৃবৃন্দ হিন্দু-সংখ্যা গুরুত্বের ভয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচন চাচ্ছেন, কিন্তু সে মনোভাব (attitude) ভিক্ষুকের। ভিক্ষা করে কেউ কখনও শক্তিমান ও মহৎ হতে পারে না। ---- স্বাতন্ত্র-নীতি দুর্বলের নীতি। সে নীতির ফল হচ্ছে চির-দাসত্ব (perpetual slavery)। এতে মুসলমানের মনের ভয় কখনও দূর হবে না। হিন্দুর প্রতি তার বিশ্বাস কখনও ফিরবে না। ---- সে এমন কিছু চায় না যার কোন মূল্য তাকে দিতে হবে না—সে কিছু ভিক্ষা চায় না, কিংবা কারও অনুকম্পার পাত্র হয়ে এ জগতে থাকতে চায় না। কারণ তার চেয়ে বড় অপমান মুসলমানের পক্ষে আর কিছুই নয়। তার দৃঢ় বিশ্বাস, মুসলিম-স্বার্থ তখনই রক্ষা হবে যখন মুসলিম-মানস বুদ্ধি, জ্ঞান ও চরিত্রের উৎকর্ষ লাভ করে হিন্দুর সাহচর্যে কর্মক্ষেত্রে মানুষের বৃহত্তর কল্যাণকে সফল ও সার্থক করে তুলতে পারবে। নির্বোধ মূর্খ হয়ে দল পাকিয়ে অপরের হাত ধরে ধরে যে সবল মুসলমান নামধারী মানুষ চলে, তাঁরা মুসলমান নয়। মুসলমান যে, সে মুক্ত; সে তার দেশের সম্পদ ও কল্যাণকে রক্ষা করবার জন্য সতত ব্যগ্র—তার কাছে মুসলমানের চেয়ে মানুষ বড়; সমাজের চেয়ে দেশ বড়।"[২১] তৎকালীন ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিরোধ হিংসা-বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হয়েছিল তার অনেকাংশের জন্য আবুল হুসেন ব্রিটিশ সরকারের নীতিকে দায়ী করেন। আবুল হুসেনের ধারণা—এ বিরোধের পেছনে ব্রিটিশ শাসন-নীতির পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে। ব্রিটিশরা ব্রাহ্মণ পরিচালিত রাষ্ট্রকেই বজায় রেখে তাঁদের শাসন-নীতি পরিচালিত করেছিল। আবুল হুসেনের মতে, এদেশে ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিই ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রধান অন্তরায়। তাঁরা শূদ্র ও ব্রাহ্মণের সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষ করার জন্য বিশেষ আয়োজন করেননি। হিন্দুদের মনোভাবের দিকে লক্ষ্য করে ইংরেজরা তাঁদের শাসন-নীতি পরিচালিত করেছে। এ প্রসঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

ড. শাহজাহান মনিরের অভিমত, "হিন্দু সম্প্রদায় ইংরেজের শিক্ষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে অগ্রসর হয়ে আছে। সরকারী চাকরি ইত্যাদি লাভ করে বিভিন্ন সুবিধা তারা ভোগ করছে। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অনীহার কারণে মুসলমানরা সরকারী চাকরি কিংবা বিভিন্ন প্রশাসনিক সুবিধাভোগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে। ফলে, হিন্দুর প্রতি মুসলমানের ও মুসলমানের প্রতি হিন্দুর বিদ্বেষ, হিংসা ও ক্রোধ দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে।"[২২]

হিন্দু-মুসলমান যৌথভাবে রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জন করুক এটা ছিল আবুল হুসেনের কামনা। ভারতে ইংরেজ শাসন সম্পর্কে আবুল হুসেনের চিন্তা-ভাবনা স্পষ্ট রূপ লাভ করেছিল। 'আমাদের রাজনীতি' প্রবন্ধে তিনি বলেন, "ব্রিটিশ পরিচালিত রাষ্ট্র এদেশের সাধারণ লোকের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করতে বিশেষ (Positive) চেষ্টা না করলেও ব্রিটিশ—সংস্পর্শে এসে এদেশের গণশক্তি তাজা হয়ে উঠেছে। তাই এদেশে ঈদানীং রাষ্ট্রের রূপ ও বিধি-বিধান পরিবর্তন করবার জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছে। ব্রিটিশ মোটের উপর ব্রাহ্মণ পরিচালিত রাষ্ট্রকেই বজায় রেখে চলছিল পার্থক্য এই যে, তাঁরা শূদ্রকে ব্রাহ্মণত্ব লাভে কিছু সাহায্য করেছেন। ---- ফলে দেশের লোকে, কি হিন্দু, কি মুসলমান শূদ্র হয়েই দিন যাপন করছে, তাদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় নাই; আর ব্রিটিশও মনের সুখে এদেশের ধন-সম্পদ আহরণ করে স্বদেশ ও স্বরাষ্ট্রের ঐশ্বর্য্য ও গৌরব বাড়িয়েছেন।"[২৩]

ব্রিটিশদের এই শাসন-নীতির দিকে লক্ষ্য করে আবুল হুসেন 'বাঙলার রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যৎ' (১৩৪০) প্রবন্ধে লেখেন, "হিন্দু সম্প্রদায়ের মনোভাব যেমন দেখা যাচ্ছে, তাতে তাঁদের তরফ থেকে co-operation পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। যদি তা না-ই পাওয়া যায়, তবে কি হাল ছেড়ে বসে থাকতে হবে? কখনই না। বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়কে এখন এই মনে করতে হবে যে, এই বাংলাদেশ আমাদের—এ যদি গোল্লায় যায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ঔদাসীন্য বা অভিমান বা ক্রোধের জন্য, তবে তার জন্য দায়ী হব আমরা মুসলমান। ---- এর শ্রী বাড়ান ও রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদেরই।"[২৪] মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি হিন্দু সমাজের বিদ্বেষ ও অশ্রদ্ধাকে আবুল হুসেন কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন এবং কোন দিন স্বদেশ, স্বজাতি ও স্ব-সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধের কথা বিস্মৃত হননি। বলা যায় স্বদেশ, স্বজাতি ও স্ব-সমাজের সেবায় নিজেকে ও দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার আগ্রহ ও উদ্দীপনা

Dhaka University Institutional Repository

জাগ্রত করাই ছিল আবুল হুসেনের জীবনের ব্রত। স্বতন্ত্র্য নির্বাচনের পর হিন্দুরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে 'শুদ্ধি' সংগঠন আন্দোলন শুরু করলে মুসলমানরা এতে বিচলিত হননি। তাঁরা এ নুতন শাসন-ব্যবস্থা মেনে নেন। আবুল হুসেন এ শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে লেখেন, "শাসন-সংস্কার-ব্যবস্থা মেনে নেওয়ার পেছনে মুসলমান সম্প্রদায়ের শান্তি-প্রিয়তা, কর্মে আগ্রহ, উচ্ছৃঙ্খল আন্দোলনের প্রতি ঘৃণা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের এই মনোভাব আজ কাজে লাগানো দরকার, নতুবা এদেশের কল্যাণ সুদূর-পরাহত। ---- বাংলার হিন্দু সম্প্রদায় আজ মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নানারূপ আন্দোলন শুরু করেছেন এবং ভয় দেখাচ্ছেন যে, বাংলাতে মুসলমান-রাজ হলে হিন্দু বিপ্লববাদীরা ক্ষান্ত হবে না—মুসলমান প্রতিনিধিদের উপর অত্যাচার করবে।"[২৫]

হিন্দু সম্প্রদায়ের এই মনোভাবের দিকে লক্ষ করে আবুল হুসেন বলেন, "হিন্দু সম্প্রদায়ের এই মনোভাব লক্ষ্যযোগ্য। সে মনোভাব দূর না হলে মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে কোনো কাজ করা সম্ভব হবে না। কিন্তু সেটা দূর করবার জন্য মুসলমান সম্প্রদায়কেই আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে মহত্তর চরিত্র ও উচ্চতর আর্দশের দ্বারা। ----সুখের বিষয়, মুসলমান সম্প্রদায় বিচলিত না হয়ে এই আস্ফালনকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। বাস্তবিক এইরূপ আস্ফালন যে একেবারে Childish তা বলাই বাহুল্য। আস্ফালনটি হেসে উড়িয়ে দিলেও এর পশ্চাতে যে মনোভাব আছে, সেটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেটা হচ্ছে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ।"[২৬]

মুসলমানদের প্রতি হিন্দু সমাজের এই অশুভ মনোভাব লক্ষ করে আবুল হুসেন এ প্রবন্ধে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এভাবে "দেখা যাচ্ছে, হিন্দু-সম্প্রদায়ের তরফ থেকে ত্রিবিধ মনোভাব বাংলার ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র-নায়কগণের চেষ্টা ব্যর্থ করবে—(১) মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি হিন্দুসমাজের বিদ্বেষ ও অশ্রদ্ধা, (২) গুপ্তঘাতকের দেশদ্রোহিতা ও (৩) আইন-অমান্যকারীদের উচ্ছৃঙ্খলতা। এই তিনটি অন্তরায় দূরীভূত না হলে কোন শুভ চেষ্টাই ফলবতী হবে না। ----বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তাঁদের উপর, যারা এই তিনটি অন্তরায় দূর করবার জন্য বদ্ধপরিকর হতে পারবেন।"[২৭] আবুল হুসেন এই তিনটি মনোভাব

Dhaka University Institutional Repository

দূর করার জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করেন।

আবুল হুসেনের রাজনৈতিক প্রবন্ধ আলোচনার উপসংহারে আমরা একথা বলতে পারি যে, তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনার মূল কারণ হলো ভারতে ব্রিটিশদের পরিচালিত শাসন-নীতি পরিহারে মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করা। হিন্দু-মুসলমানের মিলন সাধন এবং মুসলমানের জাগরণ।

তথ্য নির্দেশ

১। সাঈদ-উর রহমান সম্পাদিত, *ওদুদ-চর্চা*, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৪১

২। ঐ, পৃ. ৪১

৩। খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, বা/এ, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ২০৪-২০৫

৪। ঐ, পৃ. ২১০-২১১

৫। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ২০৯

৬। ঐ, পৃ. ২০৮

৭। ঐ, পৃ. ২১৩

৮। ঐ, পৃ. ২১৩

৯। ঐ, পৃ. ২১৮

১০। ঐ, পৃ. ২০৭

১১। ঐ, পৃ. ১৯৯

১২। ঐ, পৃ. ২০৫

১৩। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী, 'সমাজ সংস্কার' *আল এসলাম*, অগ্রহায়ণ, ১৩২৬, পৃ. ৪২৫

১৪। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২০

Dhaka University Institutional Repository

১৫। ঐ, পৃ. ২২৫

১৬। ঐ, পৃ. ২৪৭

১৭। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

১৮। ঐ, পৃ. ১৮০

১৯। ঐ, পৃ. ১৭৯

২০। ঐ, পৃ. ১৮৬

২১। ঐ, পৃ. ১৮৭-১৮৮

২২। ড.শাহজাহান মনির, *বাংলা সাহিত্য বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৭৭

২৩। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১

২৪। ঐ, পৃ. ১৯৬

২৫। ঐ, পৃ. ১৯১-১৯২

২৬। ঐ, পৃ. ১৯১-১৯২

২৭। ঐ, পৃ. ১৯৫

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

আইন বিষয়ক চিন্তা

আবুল হুসেনের জীবনী থেকে জানা যায়, তিনি কলকাতার হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি আইন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন এবং ১৯২১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে ঐ বছরই অর্থনীতি বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। এখানে থাকাকালে আবুল হুসেন আইনে বি.এল. ডিগ্রী লাভ করেন। এ সময়ে ঢাকার নবাব পরিবার ও আলেম সমাজের সঙ্গে আবুল হুসেন তথা ঢাকার বুদ্ধিমুক্তি আন্দোলনে জড়িত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র সকলের তীব্র বিরোধ চলে। এ বিরোধ এক সময়ে ব্যক্তি নির্যাতনে রূপ লাভ করে। আবুল হুসেন 'শতকরা পয়তাল্লিশের জের' (১৩৩৩) প্রবন্ধে লেখেন, "আমি যদি অনুগ্রহের ফলে অধ্যাপক না হতাম, তা হলে আমার নিজের এবং মুসলমান সমাজের পক্ষে ভালই হতো; তা হলে আমার সাধনা সার্থক হতো, কারণ যে সাধনা ব্যাহত না হয় সে সাধনা সত্য হয়ে ওঠে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই Concession-এর কৃপা আমাদের প্রতি যতই দেখান হবে, ততই আমরা খর্ব হতে থাকব। সমালোচক সাহেব আমার ত্রুটি দেখিয়ে বন্ধুর কাজই করেছেন। Concession-ই আমাকে খর্ব করেছে। Concession-এর চাকুরি করতে এসে জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা শাণিয়ে তুলতে পারছি না।"[১] আবুল হুসেনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরি নিয়েও কটূক্তি করা হয় এবং এ বিষয়ে সাপ্তাহিক *মোহাম্মদী*-তে (৩১শে বৈশাখ, ১৩৩৩) এর একটি প্রতিবাদও প্রকাশিত হয়। এতে ব্যক্তি আবুল হুসেনকে আক্রমণ করা হয়।[২] এ অবস্থায় চাকুরি ছেড়ে দিয়ে আবুল হুসেন আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯৩১ সনে আইনের উচ্চতর এম.এল. (Master of Law) ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৯৩২ সনে কলকাতা 'বারে' যোগদান করেন। আবুল হুসেন শুধু আইনের ব্যবসাই করেননি, আইন সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনাও করেছেন। এক্ষেত্রে আবুল হুসেন, আমীর আলীর আইন সংক্রান্ত কর্মপদ্ধতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলিম আইন ব্যবস্থা-শাস্ত্রের বিধানগুলিকে যুগোপযোগী করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।[৩] আবুল হুসেনের 'ব্রিটিশ ভারতে মুসলমান আইন' ও 'ওয়াক্‌ফ বিল' প্রবন্ধদ্বয়ে তাঁর সূক্ষ্ম চিন্তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি 'ব্রিটিশ ভারতে মুসলমান আইন' (১৩৩৭) প্রবন্ধে লেখেন, "ব্রিটিশ

Dhaka University Institutional Repository

অনুমোদিত মুসলমান আইনের ব্যবহার (Practice) অনেকখানি ক্ষুণ্ন হয়েছে। তাতে মুসলমান সমাজে মুসলমান আইনের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা ও ভয় অনেকখানি কমে গেছে এবং সেজন্যই মুসলমান সমাজের শ্রী ফুটতে পারছে না। ---- আরবি না জানার দরুণ অনেক ক্ষেত্রেই মুসলমান আইনের প্রকৃত মর্ম বিচারকগণ উপলব্ধি করতে না পেরে ভুল অর্থে আইনের প্রয়োগ করায় মুসলমান সমাজের বর্তমান অবস্থার সাথে মুসলমান আইনের সামঞ্জস্য হারিয়ে গেছে ও প্রতিনিয়ত যাচ্ছে।"[৪]

আবুল হুসেন মনে করতেন আইন ও আইনের সংস্কার প্রয়োজন হয় মানব কল্যাণে। আইনের প্রকৃত অর্থ যদি সাধারণের নিকট বোধগম্য না হয় তবেই আইনের ভুল ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হতে বাধ্য। সমাজের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও চাহিদার নিরিখে আইনের পরিবর্তনও স্বাভাবিকভাবে অনিবার্য। এই সংস্কারের পক্ষে আবুল হুসেনের বক্তব্য নিম্নরূপ,

"হযরত মুহম্মদ-এর যুগে আরব দেশের প্রয়োজন অনুসারে যে আইন রচিত হয়েছিল সে আইন জগতের সর্বত্র সর্ব অবস্থাতেই প্রযোজ্য বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। কিন্তু সে বিশ্বাস মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রের ইতিহাস সমর্থন করতে পারে না। সেই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এদেশের মুসলমানদের জন্য ব্রিটিশ প্রভু যে মুসলমান আইনের প্রচলন করেছেন তার জন্মভূমি ছিল আরব-মরু, বোখারা, খোরাসান ও সমরকন্দ—যার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে আধুনিক ভারতীয় মুসলমানের পরিপার্শ্বের আদৌ মিল নাই। এই জীবন্ত পরিপার্শ্বকে তুচ্ছ করে জোর-জবরদস্তী খোরাসান-বোখারার আইন হুবহু প্রবর্তন করবার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে, ভারতীয় মুসলমান মানুষ ও মুসলমান আইনের মধ্যে যে বিরোধ দিন দিন প্রবল হয়ে উঠেছে এবং তাতে ভারতীয় মুসলমান সমাজের যে অবস্থা হয়েছে তা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রই ইচ্ছা করলে দেখতে পারেন।"[৫]

আবুল হুসেনের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার সম্পর্কিত অভিমতগুলো সেকালে যাঁরা গ্রহণ করতে পারেননি, তাঁরাও তাঁর এই বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি মনে করেন যুগ বিশেষের প্রয়োজনে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনে মানুষ তার আপনার প্রয়োজন

Dhaka University Institutional Repository

অনুযায়ী আইন গড়েছেন এবং আইনের বিধি-বিধান তৈরী করেছে। কাজেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে আইনেরও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। আবুল হুসেন মনে করতেন, "ব্রিটিশ-রাজ ভারতীয় মুসলমানের মাত্র ওয়ারিসী-স্বত্ব, দান, বিবাহ, তালাক, ওয়াকফ্ ও হকশোফা সম্পর্কিত আইনের প্রচলনে সম্মতি দিয়েছেন, কিন্তু অপরাপর আইনের প্রচলন বন্ধ করেছেন। তারপর ঐ সমস্ত প্রচলিত আইন পরিচালনার জন্য মুসলমান আইন-সঙ্গত যে বিধি-বিধান প্রচলিত ছিল, যেমন—ইজমা, কিয়াস, ইজতিহাদ তাও বন্ধ করেছেন।"[৬] অর্থাৎ আবুল হুসেন এ প্রবন্ধে ব্রিটিশ ভারতে মুসলমান আইন সম্পর্কিত নীতিগুলো পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, মুসলমান সমাজে বিবাহ, তালাক ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুসলমান নারী-সমাজ পুরুষের অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে প্রতি-নিয়ত। মুসলিম বিবাহ শাস্ত্র ও তালাক সম্পর্কে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে তিনি লেখেন, "বিবাহের ভিত্তি হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর সম্মতি ও উভয়ের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব। এই সম্মতি ও ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্য যখন হারিয়ে যায় তখনই তালাকের আইন ব্যবহৃত হওয়া উচিত। এই আইন ব্যবহার করার অধিকার মুসলমান স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই সমান। কিন্তু ব্রিটিশ-ভারতে মুসলমান স্ত্রী এই সমান অধিকার হতে বঞ্চিত হয়েছে। ফলে স্ত্রীর উপর অত্যাচার নির্যাতনের অবধি নাই। স্ত্রী আজ মূক, নিরুপায়। সমাজের অর্ধাঙ্গ যদি এমনি করে আইনের অধিকার হতে বঞ্চিত থাকে এবং তার জন্য অপর অর্ধের স্পর্ধা যদি বৃদ্ধি পায় তবে সমাজের স্বাভাবিক স্ফূর্তি প্রতিহত হতে বাধ্য।"[৭] আবুল হুসেন বিশ্বাস করতেন, ব্রিটিশ-ভারতে প্রচলিত মুসলমান আইন ক্ষেত্র বিশেষে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা প্রয়োজন, অন্যথায় মুসলমানদের স্বাভাবিক বিকাশ ও নারী সমাজের মুক্তি কোনক্রমেই সম্ভব হবে না। মুসলমান সমাজের এই আর্থিক ও আত্মিক দুর্গতি দুর্নিরোধ্য দেখে আবুল হুসেন ১৯৩৪ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Tagore Law Lectures' -এর জন্য তিনি 'The History of Development of Muslim Law in British India' বিষয়ে ১৫টি বক্তৃতার একটি সার-সংক্ষেপ দাখিল করেন।[৮]

আবুল হুসেন মনে করেন, " এ দেশের রচিত ও প্রবর্তিত ব্যবহার শাস্ত্রের মধ্যে একমাত্র 'ফতোয়া-ই-আলমগিরি' ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু 'ফতোয়া-ই-আলমগিরি' হতে মুসলমান বাদশাহ্দের আইন রচনার অধিকার ও তার স্বাধীন ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া যায় না। 'ফতোয়া-ই-আলমগিরি' Reaction-এ রচিত ও প্রবর্তিত হয়েছিল। সে সময় বাদশাহ্ আলমগীর ভারতকে না দেখে দেখেছিলেন মক্কার মরুভূমির পবিত্রতা। সেই মনোভাব 'ফতোয়া-ই-আলমগিরি'কে অনেকখানি Technical I artificial করেছে। সেই মনোভাব ব্রিটিশ-ভারতে আজও আমাদের রাজা ও প্রজা উভয়কেই মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে।"[৯]

এ সময় ভারতে ব্রিটিশদের দ্বারা কতকগুলো আইন বা নীতি প্রতিষ্ঠার কারণে মুসলমানগণ সমাজের সর্বস্তর থেকে পিছিয়ে পড়ে এবং বাংলার হিন্দুরা এ সুযোগে সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করে নেয়। বাংলার মুসলমানদের সে সময়ের করুণ অবস্থার একটি চিত্র পাওয়া যায়, উইলিয়াম হান্টারের *দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স* গ্রন্থে। তিনি লেখেন, "পলাশী-যুদ্ধের সময় হইতে সিপাহী-বিদ্রোহের বহুদিন (অন্তত: পঁচিশ বৎসর) পর পর্যন্ত, প্রায় ১২৫ বৎসর যাবত ভারত-বাংলার মুসলমানদের প্রতি আমাদের অবিচারের সীমা ছিল না । এই সেদিন পর্যন্ত যাঁহারা দেশের বিজেতা ও শাসক সম্প্রদায় ছিলেন, তাঁহারা আজ গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতেও অসমর্থ। এই সম্প্রদায় আজ সর্বপ্রকারে নিঃস্ব ও ধ্বংসোন্মুখ। ইহার জন্য দায়ী আমাদের কল্পনাবিরহিত শাসন।"[১০] এদেশে ব্রিটিশ শাসকদের প্রতিষ্ঠিত কোন কোন আইন হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের কারণ বলে মনে করেন আবুল হুসেন। 'হক্‌শোফা' এমনি একটি আইন। 'হকশোফা' আইন বলতে তিনি কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে বুঝিয়েছেন। আবুল হুসেন বিষয়টির বিষদ ব্যাখ্যা করে লেখেন, " কোন তৃতীয় ব্যক্তি আপনার কোন শরিকের অংশ ক্রয় করে তবে আপনি সেই অংশ ঐ তৃতীয় ব্যক্তির নিকট হতে কিনে নিতে বা ফিরিয়ে নিতে পারেন। উদ্দেশ্য, আপনার কোন শত্রু বা অপ্রীতিকর পড়শী এসে আপনার সংসারকে বিপর্যস্ত না করে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের নজির অনুসারে যদি কোন হিন্দু আপনার শরিকের অংশ খরিদ করে তবে আপনি তাঁর থেকে সেই অংশ ফিরিয়ে নিয়ে আপনার সংসার শান্তিময় রাখতে পারবেন; কিন্তু বাংলাদেশে হকশোফার আইন হিন্দু খরিদ্দারকে আপনার শরিকের অংশ খরিদ করতে অনুমতি দিয়েছে। মুসলমান আইনের উদ্দেশ্য এখানে অনেকখানি ব্যর্থ হয়ে গেছে। ফলে বাংলাদেশের সমস্ত শহরে মুসলমানের সম্পত্তি হিন্দুর হাতে চলে গেছে ও যাচ্ছে, কিন্তু মুসলমান ইচ্ছা থাকলেও ফেরাতে পারে নাই ও পারছে না।"[১১]

Dhaka University Institutional Repository

ভারতে ব্রিটিশদের এই নীতিগুলোর কারণে মুসলমানদের হাত থেকে সম্পত্তি হাত ছাড়া হতে থাকে এবং মুসলমানরা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। 'ব্রিটিশ ভারতে মুসলমান আইন' প্রবন্ধে আবুল হুসেন ওয়াক্‌ফ আইন প্রসংগে লেখেন, "ওয়াক্‌ফ আইনে মুসলমান তার বংশধরদের জন্য সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করতে পারে। মুসলমান বাদশাহ্‌দের আমলে এই আইন অনুসারে বহু মুসলমান বড় বড় সম্পত্তি আপন বংশধরদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে গিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ আমলের বিচারকগণ ঐ প্রকার ওয়াক্‌ফকে বাতিল করে দিলেন। ফলে শত শত সম্পত্তি হস্তান্তরযোগ্য হয়ে গেল। বংশধরগণ নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঝগড়া-বিবাদে প্রবৃত্ত হল—মহাজন জমিদার নিলাম করে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি গ্রাস করতে লাগল। ক্রমশঃ এক নজিরের বলে শত শত মুসলমান পরিবার অনিবার্য দারিদ্র্যের পথে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। তার গতি এখনও প্রতিহত হয় নাই।"[১২] পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে আবুল হুসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে যখন ঢাকায় আইন ব্যবসা শুরু করেন তখনই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, মানব কল্যাণে যে আইনগুলো ইতিপূর্বে প্রচলিত ছিল, ব্রিটিশরা সে সমস্ত আইন রহিত করে নতুন নতুন নীতি প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করার ফলে মুসলমানরা সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়লেন।

আবুল হুসেনের 'ওয়াক্‌ফ বিল' সম্পর্কে চৌধুরী আবদুল গনি মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সম্পাদিত মাসিক *মোহাম্মদী*তে বিলটি সম্পর্কে ছয়টি আপত্তি উত্থাপন করে সংশোধনের জন্য প্রস্তাব করেন। আবুল হুসেন এই আইন সম্পর্কে মাওলানাদের আপত্তিসমূহ বিশ্লেষণ করে লেখেন, ২৬ ধারার উপধারাগুলো নিম্নলিখিতরূপে সংশোধন করলে মৌলানা সাহেবের আর আপত্তি থাকবে না।

২৬ (৩) ধারা উপধারা:

(b) কাউন্সিলের সভ্যগণ কর্তৃক স্থলে মুসলিম সভ্যগণ কর্তৃক।

(c) বাংলার ডিস্ট্রীক বোর্ডেও সভ্যগণ কর্তৃক স্থলে মুসলিম সভ্যগণ কর্তৃক।

(d) বাংলার মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ কর্তৃক স্থলে মুসলিম মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ কর্তৃক।

(f) একজন ডিস্ট্রীক জজ স্থলে একজন মুসলিম ডিস্ট্রীক জজ।

Dhaka University Institutional Repository

(g) একজন হাইকোর্ট জজ স্থলে একজন মুসলিম হাইকোর্ট জজ।

(h) একজন এডভোকেট স্থলে একজন মুসলিম এডভোকেট।

(I) দুইজন উকীল স্থলে দুইজন মুসলিম উকীল। এবং

একমাত্র এডভোকেট জেনারেল ব্যতীত বোর্ডের সভ্যগণ সকলেই মুসলমান হবেন এবং অধিকাংশ মুসলমান কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।[১৩]

আবুল হুসেনের মতে, "মানুষের কোন কানুনই সম্পূর্ণ নয়, কিংবা চিরস্থায়ী হতে পারে না। ---- যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী কানুন মানুষ সৃষ্টি করে; তার উন্নতির জন্য ও তার অনন্ত পথের যাত্রা সহজ করবার জন্য। ইহা শরিয়তের স্বীকার্য এবং মৌলানা সাহেবেরও স্বীকার্য। কাজেই প্রস্তাবিত ওয়াক্‌ফ বিলে ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। যা হোক, সকলের মতে বর্তমানের ত্রুটি যাতে দূর হয়, তারই চেষ্টা আমাদের করা কর্তব্য। আমি বিশেষভাবে প্রীত হলাম যে, মৌলানা সাহেবের মত ব্যক্তির মোটামুটি সমর্থন বিলটির ভাগ্যে ঘটেছে।"[১৪] আবুল হুসেনের ধারণা 'ওয়াক্‌ফ আইনের বিভিন্ন ধারা উপ-ধারাগুলিতে মুসলিম শব্দটি জুড়ে দিলে মৌলানাদের সম্পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যেত। এই কারণে বিলটির গুরুত্বের কথা ভেবে আপত্তিগুলো উল্লেখ ও সংশোধন করে আবুল হুসেন প্রবন্ধের উপসংহারে লেখেন, "মৌলানা সাহেবের নিকট আমার এই অনুরোধ যে, বিলটি যাতে এই আসছে কাউন্সিলে পাস হয়, তার জন্য তিনি প্রাণপণ কোশেশ করবেন।"[১৫]

আবদুল কাদির তাঁর 'চিন্তানায়ক আবুল হুসেন' প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে লেখেন, "ঢাকার আদালতে ওকালতি করার সময়ই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ওয়াক্‌ফ আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা। সে সম্বন্ধে তিনি প্রায়ই আমাদের বলতেন। সেদিন কলকাতার মুস্‌লিম ইনষ্টিটিউট হলে আবুল হুসেন সাহেবের শোক সভায় খাঁ বাহাদুর আবদুল মোমিন উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে বলেছেন যে, ওয়াক্‌ফ আইন আবুল হুসেন সাহেবেরই সৃষ্টি, এই গৌরব একান্তভাবে তাঁরই প্রাপ্য।"[১৬]

অতএব আমরা বলতে পারি যে, আবুল হুসেন শুধু ওয়াক্‌ফ বিলের পরিকল্পনা করেননি ওয়াক্‌ফ আইনেরও তিনি জনক। ব্রিটিশ ভারতে মুসলিম আইনের ফলাফল ও মুসলমান ব্যবস্থা শাস্ত্র প্রভৃতি বহু বিষয়েই তাঁর মৌলিক গবেষণা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ৩৯৫

২। ঐ, পৃ. ৩৯৫

৩। কাজী আবদুল ওদুদ, আমীর আলী স্মরণে, *প্রতিকা*, ১ম বর্ষ, ঢাকা, ১৩৩৮, পৃ. ১৬

৪। ঐ, পৃ. ১২৪

৫। ঐ, পৃ. ১২৩

৬। ঐ, পৃ. ১২৪

৭। ঐ, পৃ. ১২৫

৮। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

৯। ঐ, পৃ. ১২৬

১০। WW Hunter, *The Indian Musalmans* premier book House, Lahore, ১৯৬৪, পুনরোল্লিখিত এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ২৬৮

১১। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪

১২। ঐ, পৃ. ১২৪-১২৫

১৩। ঐ, পৃ. ১২৮

১৪। ঐ, পৃ. ১২৭

১৫। ঐ, পৃ. ১৩১

১৬। ঐ, পৃ. ৩৮৮-৩৮৯

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

মনীষীদের জীবন-সাধনা বিচার

বাঙালি মুসলমান সমাজের দুর্দিনে জ্ঞানদীপ্ত উপাসনাপুষ্ট ও সত্যনিষ্ঠ মহাপ্রাণ পুরুষদের জীবন-চরিত্র বিশ্লেষণ আবশ্যক মনে করে আবুল হুসেন ইতিহাস খ্যাত আল্-মামুন, স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁন ও সুফী হাশিম—এদের জীবন ও চরিত্র মাহাত্ম্য দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে অনুকরণীয় বলে মনে করেছেন। 'চরিত্র' (১৩৩৪) শীর্ষক প্রবন্ধে আবুল হুসেনের অভিমত, "জীবন-চর্চা করে চরিত্র প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এই জীবন-চর্চা বলতে বুঝতে হবে জীবনের সর্বপ্রকার প্রবৃত্তি, গুণ ও শক্তিকে সুস্থ ও পুষ্ট করে তোলা।"[১] আবুল হুসেনের মতে, চরিত্র মানুষের সাধনার ফল, একে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সঙ্গীত, চিত্রাংকন, অভিনয় ইত্যাদি বৃত্তির চর্চা করা প্রয়োজন।

শৈশবে আবুল হুসেন পিতা ও পিতামহের বিদ্যানুরাগ, সত্যসন্ধ, সংস্কার-প্রবণ মূল্যবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পিতামহ মৌলবী মোহাম্মদ হাশিম সম্পর্কে আবুল হুসেন 'সুফী হাশিম' (১৩৩৩) নামক প্রবন্ধে লেখেন, "ক্ষণজন্মা নর-নারীর মধ্যে যাঁহারা ব্যাপকভাবে তাঁহাদের কার্যাবলী জগতের সমক্ষে ধরিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা সর্বত্র পরিচিত এবং তাঁহাদের জীবন কাহিনী আমরা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করি। কিন্তু এমন অনেক নর-নারী পরলোক গমন করিয়াছেন, যাঁহাদের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না; অথচ তাঁহারা প্রকৃতই চরিত্রবান্, প্রতিভাশালী, পরোপকার ব্রতী ও ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন এবং মানুষের অনেক কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। সুফী হাশিম এই শ্রেণীর একজন পূত চরিত্রের মুমিন মুসলিম ছিলেন।"[২] আবুল হুসেনের লেখা উক্ত প্রবন্ধে থেকে জানা যায়, সুফী হাশিম ছিলেন জ্ঞান সাধক ও ধর্মানুরাগী। 'বিছ্মিল্লাহ্ আমানতুবিল্লাহ্ তাওয়াককালতু আল্লাহ' এই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। তিনি কোরান, হাদিস, আরবি ও ফারসী সাহিত্যে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। সুফী হাশিম পিতার জমি-জমা ত্যাগ করে, "নলডাঙ্গার রাজা ইন্দ্রভূষণের শিক্ষকতা করিতে নিযুক্ত হইলেন। তিনি এই রাজ সরকারে নানাবিধ কাজ করিয়া যে অর্থ

Dhaka University Institutional Repository

উপার্জন করিতেন তাহা দ্বারাই সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেন। রাজ-সেরেস্তার কাজ সম্পন্ন করিয়া যে অবসর পাইতেন, তাহা তিনি কেতাব পড়িতে ব্যয় করিতেন। কেতাব পাঠ তাঁহার একরূপ স্বভাব হইয়া গিয়াছিল। ---- তিনি বলিতেন, 'আমি কিছুই শিখি নাই, কেবল শিখিবার পথ দেখিয়াছি। কেতাব না দেখিয়া বলিলে যদি আমার ভুল হয়, তবে কে দায়ী হইবে'? ---- রাজ-সেরেস্তার কাজ করা ব্যতীত ধর্মপ্রচার করা তাঁহার পারিবারিক জীবনের অন্যতম কার্য ছিল।"[৩] জ্ঞান সাধক সুফী হাশিম পশ্চাদপদ মুসলমান সম্প্রদায়কে শিক্ষিত ও জ্ঞানী করার উপায় উদ্ভাবনের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। মুসলমানকে কিরূপে প্রকৃত শিক্ষিত ও চরিত্রবান করা যায় — তার উপায় নিরূপণ করতে তিনি ব্যস্ত থাকতেন।

সুফী হাশিম পৌত্তলিকতা, পীরের দরগায় মান্ত' পছন্দ করতেন না। পিতামহ সম্পর্কে আবুল হুসেন লেখেন, "তিনি পীরের দরগা যাহাতে পূজার বস্তু হইয়া না পড়ে তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। ---- মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত ইসলাম জারি হয় নাই এবং পীর-পরস্তি তাহার স্থানে স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে। তিনি এই জন্য পীর পূজার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতেন এবং স্থানে স্থানে অর্থলোলুপ ভণ্ড পীরের সহিত তর্ক করিয়া লোক-সমক্ষে তাহাদের মতলব ও দুষ্ট চরিত্র প্রকাশ করিয়া ধরিতেন।"[৪] ইসলামের নানাবিধ অনুষ্ঠানের প্রতি মৌলবী মোহাম্মদ হাশিম-এর এরূপ প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও কঠোর সাধনার জন্য লোকে তাঁকে 'সুফী' উপাধিতে ভূষিত করেন।[৫] সুফী হাশিম ১৮২১ সনে যশোহর জেলার কাউরিয়াগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৬]

আবুল হুসেনের মতে, মানব-সভ্যতার বিকাশ সাধনে যুগ যুগ ধরে যাঁরা আত্মত্যাগ করে গেছেন তাঁরা সাধক। স্যার সৈয়দ আহমদ খান ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আধুনিক ভারতে শিক্ষার ফলে যে সভ্যতার বিকাশ লাভ করেছে সে শিক্ষা-ব্যবস্থার সর্ব প্রথম ব্যক্তিত্ব হিন্দুদের ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায় আর মুসলমানদের স্যার সৈয়দ আহমদ খান। তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করলেন মুসলমানদেরকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে চলিষ্ণু হওয়ায় সাহায্য করতে। তিনি বুঝেছিলেন মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানে শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে অগ্রসর হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁরা পিছিয়ে পড়বে।"[৭] আর "রামমোহনের যে

Dhaka University Institutional Repository

অমর স্বপ্ন হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে ভারতীয় জাতি গঠনে সাহায্য করে ভারতের মুক্তি-সাধন তার জন্য আর বড় চেষ্টা কিছু হল না। আজ হিন্দু সমাজ শাস্ত্রের দিকেই ঝুঁকে পড়েছেন — ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান কিছু হাসিল করেও তাঁরা অতীতের দিকে মুখ ফিরিয়ে আছেন। রামমোহন চেয়েছিলেন ঐ মুখকে অতীত হতে ফিরিয়ে ভবিষ্যতে নিবদ্ধ করতে কিন্তু তা হল না-তার একমাত্র কারণ এই যে, তাঁর শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন উদ্দেশ্যে তিনি শাস্ত্র-বচনে মুড়ে তাঁর প্রাণের সত্যকে প্রচার করেছিলেন।"[৮] আবুল হুসেনের মতে, রামমোহনের সে উদ্দেশ্য অনেকখানি ব্যর্থ হয়েছে। কারণ তিনি তৎকালীন জনসাধারণের বিশ্বাস ও মনোভাবের প্রতি Concession দিতে গিয়ে শাস্ত্র বচনের আশ্রয় নিয়েছিলেন। একারণে হিন্দুদের মুখ রয়ে গেল পেছনের দিকে। এই ব্যর্থতাকে নির্দেশ করতে আবুল হুসেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৯২৯) প্রবন্ধে লেখেন, "শাস্ত্র যে মানুষের সৃষ্টি, আর সে শাস্ত্রকে অতিক্রম করে প্রয়োজনানুযায়ী যুগ ধর্মকেই মেনে চলাতেই যে মানুষের মুক্তি, সে কথা রামমোহন অন্তরে অনুভব করেছিলেন; কিন্তু দিল খুলে তা বলতে সাহস পান নাই। তাঁর শ্রোতৃবর্গের Concession দিতে গিয়ে তাঁর দুর্বলতাকে আমল দিতে হয়েছিল, সেই দুবলতাই তাঁর Mission -কে ব্যাহত করেছে। আজ তাই হিন্দু সমাজ রামমোহনের প্রদর্শিত পথ হতে অনেক দূরে সরে পড়েছে।"[৯] রামমোহন ও স্যার সৈয়দ আহমদের দৃষ্টি ভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য থাকায় উভয়ের Mission পুরোপুরি সার্থকতা লাভ করেনি। রামমোহনের দৃষ্টি ছিল সুদূর প্রসারী, আর স্যার সৈয়দ আহমদের দৃষ্টি ছিল তাঁর আপন আঙ্গিনায় নিবদ্ধ। উভয়েই শাস্ত্রের মোহে সম্মোহিত হয়ে রইলেন। আবুল হুসেন উভয়ের উদ্দেশ্যে যে অভিমত ব্যক্ত করেন তাহলো, "রামমোহনের স্বপ্নের যে অবস্থা (Fate) হয়েছে, স্যার সৈয়দের স্বপ্নেরও সে Fate হয়েছে। তিনিও শাস্ত্র-বচন দিয়ে তাঁর কথার জোর বেঁধেছিলেন; ফলে, লোকে সেই শাস্ত্র-মোহেই সম্মোহিত হয়ে থাকল। ইংরেজী হাব ভাব, পোশাক-পরিচ্ছদ, ফ্যাশন সবই আয়ত্ব করে আমরা স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত করে ছাড়ছি, তবু শাস্ত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ইসলামের দোহাই দিয়ে মুসলমান বলে আস্ফালন করে বেড়াচ্ছি। মনের ঘরে আমাদের যে অন্ধকার সেই অন্ধকারই রয়ে গেছে। হিন্দু যেমন শাস্ত্রমুখী মুসলমানও তেমনি শাস্ত্রমুখী হয়ে রইল।"[১০]

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হুসেনের মতে, রামমোহনের স্বপ্ন ছিল হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ে এক জাতি গঠন করা। মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের নমনীয় মনোভাব আনয়নের স্বপ্ন স্যার সৈয়দ আহমদ দেখেছিলেন। খ্রীষ্টান-মুসলিম মিলনে তিনি (স্যার সৈয়দ আহমদ খান) যে চেষ্টা করেছেন, তার সামান্য পরিমাণ চেষ্টা যদি হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ের জন্য করতেন তাহলে আজ ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের চেহারা অন্য রকম দাঁড়াত। তিনি আজ এমন একজন মহাপুরুষের স্বপ্ন দেখছেন, "যিনি দেশের বুকের উপর পা শক্ত করে দাঁড়িয়ে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দু:খ-বেদনা সমানভাবে বহন করে স্যার সৈয়দ আহমদকে অতিক্রম করে রামমোহনের রচিত স্বপ্নের অনুরূপ এক বড় স্বপ্ন খাড়া করে হিন্দু-মুসলিম উভয়কে একই পথে চালিত করতে সক্ষম হবেন। আজ চাই স্যার সৈয়দ আহমদের কর্ম কুশলতা, হামদর্দি, অনন্ত উৎসাহ, প্রচণ্ড আবেগ আর রামমোহনের তীক্ষ্ম বিশাল দৃষ্টি ও মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় দীপ্ত স্বপ্ন এই সমস্তের সংমিশ্রণে পরিপুষ্ট ব্যক্তিত্ব—সমুজ্জ্বল মহাপুরুষ কর্মী স্যার সৈয়দ আহমদ ও স্বাপ্নিক রামমোহনের পরিপূর্ণ সমন্বয় চাই।"[১১] রামমোহনের সুদূর প্রসারী চিন্তার ফলে হিন্দুরা জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করতে উঠে পড়ে লাগল। মুসলমানের ঘুম তবুও ভাঙল না। তার ফলে আজও মুসলিম সমাজ মাত্র সর্বত্রই Too late। স্যার সৈয়দ আহমদ অবশ্য হিন্দু-মুসলিম ও খ্রীষ্টানদের মিলন ও সমন্বয় প্রয়োজন অনুভব করে ১৮৮৩ খ্রীঃ Scientific Society গঠন করেছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমদ ছিলেন মূলত মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের জনক।[১২]

আবুল হুসেন মনে করেন, 'চরিত্র' মানুষের ভূষণ। 'চরিত্র' বলতে তিনি সুস্থ বিকশিত একজন মানুষের প্রকৃতিকে বুঝিয়েছেন। 'আল মামুন' এমনি একটি চরিত্র। আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন-এর নাম অনুসারে আবুল হুসেনের উদ্দ্যোগে ১৯২৭ সালে আল মামুন ক্লাবের সৃষ্টি হয়। এসময়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। আল মামুন ক্লাবের দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম অধিবেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম হল বর্ধমান হাউসে আবুল হুসেন 'আল মামুন' (১৩৩৭) প্রবন্ধটি পাঠ করেন।"[১৩] আল্ মামুনের চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে *শিখার* অন্যতম লেখক ড. কালিকারঞ্জন কানুনগো তাঁর 'খলিফা আবদুল্লাহ্ আল্ মামুন' প্রবন্ধে বলেন, "মুসলমান-জগতে যে সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,

Dhaka University Institutional Repository

খলিফা হারুন-অল-রশিদের জেষ্ঠ্যপুত্র আল্ মামুন তাঁহাদের অন্যতম।"[১৪] আল্ মামুনের নামে ক্লাব গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আবুল হুসেন 'আল্ মামুন' প্রবন্ধে লেখেন, "খলিফা আল্ মামুন ছিলেন বাগ্‌দাদ খলিফাদের অগাষ্টস্- যাঁর হাতে ইসলাম এক নূতন রূপ ও শক্তি লাভ করেছিল। আমাদের বর্তমান সমাজ জীবনে ইসলাম যে রূপ নিয়ে সকলের মনে নৈরাশ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে তুলেছে, তাতে আজ আল্ মামুনের কীর্তির দিতে দৃষ্টিপাত করলে অনেকটা আশা ও উৎসাহ লাভ করতে পারব বলে আমার বিশ্বাস।"[১৫]

আবুল হুসেনের ধর্মচিন্তা ও সমাজচিন্তা বিষয়ক ভাবধারার সঙ্গে আল্ মামুনের ধর্মচিন্তা ও সমাজচিন্তার মিল রয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। আর এ জন্যে আবুল হুসেন আল্ মামুনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে তাঁর রাজত্বকালের বহু ঘটনা এ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেছেন বলে অনেকের ধারণা। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে আল্ মামুনের দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করে আবুল হুসেন উক্ত প্রবন্ধে লেখেন, "প্রতিভাবানের দৃষ্টি দিয়ে আল্ মামুন দেখলেন, ইসলাম কতকগুলি সূত্রের জালে জড়িয়ে প্রকৃত রূপ হারাতে বসেছে। আর সে জাল কেটে না দিলে সেরূপ ফুটতে পারবে না। ---- ইসলাম যদি গুটি কয়েক তথাকথিত অপরিবর্তনীয় সূত্রের সমষ্টি হয় তাহলে মানুষের মন কখনো পরিবর্তনশীল জগতের আঘাতে স্পন্দন করবে না এবং মুক্ত বা জীবন্ত হবে না, বরং ডগ্‌মার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে কতকগুলি অর্থহীন শব্দ নিয়ে নিশ্চিন্তে থাকবে। সে মন কখনও মুসলমানকে মানুষ করতে পারবে না। মন চায় গতি, ডগ্‌মা সে গতিকে রুদ্ধ করে।"[১৬] এখানে আবুল হুসেন ইসলাম সম্পর্কে তাঁর নিজের বক্তব্যকেই উপস্থাপন করার জন্য আল মামুনের প্রসঙ্গ টেনেছেন। এ প্রবন্ধে আবুল হুসেন আল মামুনের ঘটনাবহুল জীবন ও রাজত্বকালের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর ধর্ম নিরপেক্ষ জীবন ও চিন্তা-চেতনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[১৭] এ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু থেকে একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে আবুল হুসেন সহ 'শিখা গোষ্ঠী'র অনেক লেখকই তখন আল মামুনের বিদ্যানুরাগ, যুক্তিনিষ্ঠা ভাবাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও আগ্রহী ছিলেন। আল মামুনের জীবন-চরিত সম্পর্কে আবুল হুসেনের মন্তব্য হলো--"মামুন নিজে অত্যন্ত উদারচিত্ত ছিলেন। ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় সাধন করাই তাঁর এক স্বপ্ন ছিল। তিনি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের জন্যই রাজকর্মচারীর পদ উন্মুক্ত করেছিলেন। রাজকার্য পরিচালনের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

তিনি যে কাউন্সিল নিযুক্ত করেন তার মধ্যে সমস্ত সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি ছিলেন।"[১৮] 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র লেখকরা মুতাযিলাপন্থী আল্ মামুনের বিচক্ষণতা, দৃঢ় সঙ্কল্পতা, দয়াদ্রচিত্ততা, বদান্যতা, তীক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি ও বজ্রকঠোর দৃঢ়তা তাঁর শাসন কালকে ইসলামের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায় বলে মনে করতেন। আবুল হুসেন তুরস্কের মোস্তফা কামাল এবং আফগানিস্থানের বাদশা আমানুল্লাহ্কে আল্ মামুনের অনুসারী হিসেবে অভিহিত করে প্রবন্ধের উপসংহারে বলেন, "আজ মুসলিম জগতে তাঁর মত ব্যক্তির আবির্ভাব হওয়া অত্যন্ত দরকার হয়েছে। মনে হয় কামাল এবং আমানুল্লাহ্ মামুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইসলামের আর এক কিস্তী নবস্ফূর্তি জগতের ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তিরূপে খাড়া করতে সমর্থ হবেন। আর সেই নব-জোশে নব-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে কোরানের বাণী ও হযরতের চরিত্র উপলব্ধি করে শক্তিমান হয়ে ঘুমন্ত ও নির্জীব মুসলিম বাঙলার বুকে নব নব সৃষ্টির দ্বারা মুক্তির আস্বাদ সৃষ্টি করে তাকে কর্মের পথে তুলে দেওয়ার জন্য নব নব প্রতিভার সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত হোক, রাব্বুল আলামীনের নিকট এই প্রার্থনা করি।"[১৯]

'আল্ মামুন ক্লাব' সেকালে নতুন লেখক সৃষ্টিতে ও নারী শিক্ষার প্রতি বিশেষ তৎপর ছিলেন। আবুল ফজলের লেখা থেকে জানা যায় ১৯২৭ সালে মিস্ ফজিলাতুন্নেছা নামে একজন মুসলমান শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অংক শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করলে 'আল মামুন ক্লাবে'র পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দিত করা হয়। উক্ত সভায় ফজিলাতুন্নেছা অভিনন্দনের উত্তরে 'মুসলিম নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক এক দীর্ঘ লিখিত ভাষণ প্রদান করেছিলেন।[২০]

উপরের আলোচনা থেকে এ সত্য প্রমাণিত হয় যে, সৎ মানুষের জীবন-চর্চা থেকে সৎ চরিত্রের অধিকারী হওয়া যায়। সুফী হাশিম, আল্ মামুন এমন দু'টি চরিত্র।

তথ্য নির্দেশ

১। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ১৫

২। ঐ, পৃ. ২৭৮

৩। ঐ, পৃ. ২৮১-২৮২

৪। ঐ, পৃ. ২৮৪

Dhaka University Institutional Repository

৫। ঐ, পৃ. ২৮২

৬। মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, *জীবনীগ্রন্থমালা* - ১৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ১১

৭। ড. শাহজাহান মনির, *বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩১

৮। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৫

৯। ঐ, পৃ. ২৬৫-২৬৬

১০। ঐ, পৃ. ২৬৬

১১। ঐ, পৃ. ২৬৭

১২। ঐ, পৃ. ২৭৫

১৩। মোরশেদ শফিউল হাসান, *নির্বাচিত প্রবন্ধ আবুল হুসেন*, মাওলা ব্রাদাস, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৩২

১৪। খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ:সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১০৫

১৫। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫১

১৬। ঐ, পৃ. ২৫৯

১৭। *বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮০

১৮। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৮-২৫৯

১৯। ঐ, পৃ. ২৬২

২০। আবুল ফজল, *রেখাচিত্র*, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৬৫, পৃ. ১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়

ছোটগল্প ও নাটক

আবুল হুসেন ছিলেন মূলত প্রাবন্ধিক। 'ছোটগল্পের ধারা' প্রবন্ধে তিনি বাংলা ছোটগল্পের বর্তমান অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন এবং ছোটগল্পের অবস্থান সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করে লেখেন, "সাহিত্য যখন বেশ পুষ্ট হয় তখনই ছোটগল্প বিকাশ লাভ করে। আমি বলি, বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণ পুষ্টি লাভ করিবার পূর্বেই ছোটগল্পের আমদানী হইতেছে। মানুষের ভাব ও কার্যের যথাক্রমে অল্পতা ও প্রাচুর্যের সঙ্গে সঙ্গে ছোটগল্প মানব মনের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে আসে। ইউরোপ আজ সেই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। সুতরাং সেখানে ছোটগল্পের আবিস্কার হইয়াছে তাহাদের সামাজিক অবস্থার পীড়নে। ----আমাদের ছোটগল্পগুলি কেবলমাত্র সাধারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা কিংবা সময় বিশেষে কাহারও মনের ভাব ও সুখ-দু:খের আবেশে আবিষ্ট প্রাণের বিশিষ্ট খেলা লইয়া লিখিত হইয়া থাকে—যাহা সকলেই জানে কিন্তু প্রকাশ করতে অক্ষম।"[১] অর্থাৎ আবুল হুসেন মনে করেন, ইউরোপীয় সাহিত্যে ছোটগল্পের আবির্ভাব ছিল স্বাভাবিক। তাঁরা যেভাব প্রণোদিত হয়ে ছোটগল্প রচনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাত কুমার মুখ্যোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সে ভাবধারায়ই ছোটগল্প রচনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু তাতে সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

আবুল হুসেন যে কয়টি ছোটগল্প রচনা করেন তাতে বাঙালি মুসলমান নারী সমাজের বহুমুখী সমস্যাবলী তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এসব গল্পের মধ্যে নারীর জীবনের পর্দাপ্রথা, স্ত্রী শিক্ষা, বাল্য বিবাহ প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'রুদ্ধ ব্যথা' (১৩২৬) গল্পে আবুল হুসেন মুসলমান নারী সমাজের একটি করুণ চিত্র এঁকেছেন। মুসলমান নারীর পর্দাপ্রথা, বড়ুর স্বামী ও শ্বশুর বাড়ি সম্পর্কে আবুল হুসেন উক্ত গল্পে লেখেন, "ইহারা সুপ্রাচীন খান্দানের লোক। তাহাদের বাড়িতে দূর সম্পর্কীয় ভাইদের সঙ্গে বোনদের দেখা সাক্ষাৎ ছিল না, এমন কি দূর সম্পর্কীয় গুরুজনও কনিষ্ঠ কন্যা স্থানীয়াদের সঙ্গে কথার আদান-প্রদান পর্যন্ত করিতে পারিতেন না। ---- তাহার (বড়ুর) অন্তরের ভিতরকার অশান্তি

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশের অভাবে গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতে চাহিত কিন্তু সমাজ ও লৌকিক আচারের চোখ রাঙানিতে সে থামিয়া থাকিত—তবু রুদ্ধ বেদনার জ্বলন্ত আগুন ধিকি ধিকি জ্বলিয়া তুষের আগুনের মতো নীরবে তাহার ভিতরটা খাইয়া ফেলিতে ছাড়িল না। কিন্তু অন্তরের অবস্থা অন্তরেই রহিয়া গেল।"[২]

আট বছর বয়সের বড়ুর পিতা অবেজ মিয়া বড়ুকে স্কুলের পাঠ সমাপ্ত দিয়ে রান্না-বাড়ার কাজে মনোযোগ প্রদানের নির্দেশ দেন। অবেজ মিয়ার ধারণা, "মেয়েদের সাত আট বছর বয়স হলে পর্দার বাহিরে যাওয়া নিষেধ। গেলে গোনাহ্ হয়—দোজখের আগুনে পুড়তে হয়। বালিকা বড়ুর প্রাণ দোজখের আগুনের কথা শুনিয়া ভয়ে চমকাইয়া গেল। ---- হিন্দু মেয়েগুলি কি তাহলে পুড়ে মরবে? ---- সেই অবধি বড়ু আর স্কুলের নামও করে না এবং বই-কাগজের সঙ্গে সম্পর্কই রাখে না।"[৩]

বড়ুর স্কুলে যাওয়া ও লেখাপড়া শিক্ষার প্রতি ছিল প্রবল আগ্রহ। তাই যখন স্কুলের সময় হতো তখন বড়ু বাড়ির বারান্দার দরজায় দাঁড়িয়ে হিন্দু মেয়েদের দলবেধে স্কুলে যাওয়া দেখত, আবুল হুসেন লেখেন, "তখন তাহার ক্ষুদ্র প্রাণে কত ইচ্ছা যে জাগিয়া উঠিত ও পিতার কঠোর আদেশের মর্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া কত যে তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিয়া যাইত তাহা কেহ বুঝিত না। বারোটা না বাজিলে, মেয়েদের স্কুলে যাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত এইরূপে প্রত্যহ সে পলকহীন হইয়া সকাতর নয়নে কেবলই রাস্তার পানে তাকাইয়া তাকাইয়া স্কুলের কাজ লইয়া ভাবিয়া ভাবিয়া অন্তরে অত্যন্ত অস্থির হইত। কিন্তু তাহার তাহা বলিবার জো ছিল না।"[৪]

বড়ুর মা-বাবা বড়ুকে বোঝানোর চেষ্টা করে মেয়ে মানুষের বেশী লেখাপড়ার প্রয়োজন নেই। কি হবে লেখাপড়া শিখে। বিয়ে হলে স্বামী, শ্বশুর ও শ্বাশুড়ী-সংসার এই সব নিয়েই থাকতে হবে। কিন্তু বড়ু বুঝতে পারছে না, কেন সে স্কুলে যেতে পারবে না, তাই বাবা অবেজ মিয়াকে বলে, "ঐ যে আমার চেয়ে বড় বড় ঢেঙ্গা হিন্দু মেয়ে স্কুলে যায়।"[৫] আর বড়ু অতি অল্প বয়সেই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বামীর ঘরে যেতে বাধ্য হয়। এক সময় বড়ু অসুস্থ হয়ে পড়লে স্বামী মৌলবী মালিক মিয়া সামাজিক আচার লঙ্ঘন করে পর্দানশীল স্ত্রীকে শহরের ডাক্তার কিভাবে দেখাবে এ ভাবনা যেন শেষ হয় না। আবুল হুসেন লেখেন, "কচির মা'র

Dhaka University Institutional Repository

(বড়ুর) মুখ দিয়া কেবলই রক্ত উঠিতেছে।গ্রামের ডাক্তার আসিয়া ঔষধ দিয়া রক্ত বন্ধ করিল কিন্তু রোগ সারাতে পারিল না। বড় ডাক্তার আর আনা হইল না। ---- কচির মা ক্রমে শুকাইয়া চলিল।"[৬] বিবাহ যোগ্য কন্যা কচি ঘরে থাকা অবস্থায় পাড়া-পড়শি সবাই দেখতে পেল—কচির ছোট মা রান্না ঘরে ভাত রাঁধিতেছেন।[৭] আবুল হুসেন মনে করেন, মুসলমান সমাজে নারীর অধ:পতনের কারণ হচ্ছে পর্দাপ্রথা, বাল্য বিবাহ ও শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসরতা। এ প্রসঙ্গে ড. শাহজাহান মনিরের অভিমত পর্দা ও ধর্মের দোহাই দিয়ে পুরুষ শাসিত সমাজ মুসলমান নারীর প্রতি অমানবিক আচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। আট বছর বয়সের অবুঝ মেয়ে বড়ু চরিত্রের মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ ঘটেছে।[৮]

'নেশার ফের' (১৩৩৪) গল্পে আবুল হুসেন শিক্ষার অভাবে মুসলমানের চারিত্রিক অধ:পতন কিভাবে ঘটে তার একটি বাস্তব চিত্র এঁকেছেন জৈনদ্দীন চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে। গল্পের সূচনায় তিনি জৈনদ্দীন ও তার পারিবারিক ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, "জৈনদ্দীন শেখ কিসমত খাঁর গলির একখানি ছেঁড়া টিনের ঘরে বাস করে; তার বাপ-দাদারা নাকি বাদশাহের আমল থেকে কাসিদা শিল্পের কাজের জন্য খুব নামজাদা লোক বলে প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু জৈনদ্দীন এখন গাড়োয়ান। ---- বাপ-দাদাদের অর্জিত সম্পত্তি যা ছিল, তা তার দাদার-পরদাদার গোষ্ঠির মালিকেরা ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছিল। তার বাপের অংশে যা ছিল, তা সে স্ফূর্তি, খেলা, মদ, খাঁজা, ভাঙ, কোকেন প্রভৃতি যাবতীয় নেশায় উড়িয়ে দিয়ে অবশেষে চাবুক ধরতে বাধ্য হল। এখন সে দিন আনে দিন খায়।"[৯]

এখানেই জৈনদ্দীন জীবনের পরিসমাপ্তি নয়। জৈনদ্দীন ঘোড় দৌড়ের বাজির নেশায় রাতারাতি বড় হওয়ারও স্বপ্ন দেখে। পিতৃ নিদর্শন নিজের শেষ সম্বল ঘর বন্ধক রেখে জৈনদ্দীন পথে নেমে আসে। আবুল হুসেন লেখেন, "দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে জৈনদ্দীন প্রতিজ্ঞা করল—জমিলা জেনে রাখ, তোমার চোখের গরম পানিতে এই বার আমার নেশার কালিমা সব ধুয়ে পরিস্কার হয়ে যাবে।"[১০]

দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট জৈনদ্দীনের জীবন যাত্রার করুণ চিত্রে যুক্ত হয়েছে 'স্নেহের টান' গল্পের দেলা ও ছলে। এক বিধবার এই দুই ছেলে (দেলা ও ছলে)। মীর বংশের মর্যাদায় পারিবারিক অন্ত:সারশূন্য দেলা ও ছলে দারিদ্র্যের নিষ্ঠুরতম অবস্থার শিকার। দেলা ও ছলে

Dhaka University Institutional Repository

যখন ৬ ও ৩ বছরের অবুঝ শিশু তখন তারা পিতার আদর-স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে একমাত্র বিধবার আদরে বড় হয়েছে, "কিন্তু পড়াশুনার দফায় শূন্য পড়িয়া রহিল। কেবল শারীরিক পরিশ্রমের উপর তাহাদের জীবন। জমিজমা বিদ্যাবুদ্ধি যাহার বলে মানুষ বাঁচিয়া থাকে তাহার কিছুমাত্র বিধবার বাচ্চা দু'টির ছিল না। ---- লাঙ্গল তা ধরিতে পারিবে না—নিড়ানী কিংবা কোদাল হাতে করিলে অপমান হইবে। তাহারা যে মানী মীর বংশের ছেলে।"[১১]

দারিদ্র্যের কঠিন রূপ অর্ধাহার-অনাহারে দিন কাটতে থাকে রুগ্ন মাতা আর দুই ভাইয়ের । নিমোনিয়ায় আক্রান্ত ছোট ভাই ছলে এক সময় সংসার গড়ে। মাতা ও ভাইয়ের বিশৃঙ্খল সংসার থেকে কর্মক্ষম বলিষ্ট বড় ভাই দেলা 'যুদো' (ভিন্ন) হয়ে যায়। বিধবা ও তার রুগ্ন ছেলে সংসারের হাল ধরতে না পারার কারণে ছলে সমস্ত স্নেহের টান ছিন্ন করে চলে যাওয়ার মুহূর্তে দেলার উক্তিটির মধ্য দিয়ে গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটে, "ভাই আর আলাদা হইব না—তুমি আমার ভাই মা'র পেটের।"[১২]

রুদ্ধ ব্যথা, নেশার ফের ও স্নেহের টান গল্পের ধারার সঙ্গে 'মিনি' গল্পের স্বাভাবিক প্রভেদ রয়েছে। আবুল হুসেন 'মিনি' গল্পে কোন সামাজিক সমস্যা বা তার সমাধান তুলে ধরার উদ্দেশ্যে রচনা করেননি, মানুষ ও পশুর মমত্ববোধের আড়ালে রস সৃষ্টির ইচ্ছায় আবুল হুসেন এ গল্প রচনা করেছেন।[১৩] মিনি অলংকারে সজ্জিত ধবধবে সাদা একটি বিড়ালের প্রভু ভক্তির কাহিনী। 'মিনি' গল্পের নায়িকা জমিলা কর্তৃক অতি আদরে লালিত-পালিত হতো। জমিলার বিয়ে হলে মিনিও জমিলার সঙ্গে তার শ্বশুর বাড়ি চলে যায়। জমিলার স্বামী নূর মোহাম্মদ কখনো বিড়াল পছন্দ করতেন না, নব-বধুর অতি আদরের বলে ধীরে ধীরে স্ত্রীর পাশাপাশি মিনিকে আদর যত্ন করতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে আবুল হুসেন লেখেন, "থাকিয়া থাকিয়া মিনিকে ধরিয়া সোহাগ করিবার জন্য নূরের হৃদয়ে অতর্কিতভাবে এক অব্যক্ত আবেগের প্রেরণা উপরে উঠিতে চাহিত—নূর তাহা চাপিয়া রাখিত।"[১৪]

নূর ও জমিলার তিন বছরের সুন্দর সংসার জীবনে, দুনিয়ার আলো-বাতাসে মিনির সুখের দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। এর মধ্যে জমিলা কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করলে নূর ও মিনির জীবনে নেমে আসে শোকের করুণ ছায়া। আবুল হুসেন মনে করেন, মিনি নিকৃষ্ট প্রাণী কিন্তু মানুষের মতো মন ও ভাবে সে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আবুল

Dhaka University Institutional Repository

হুসেন লেখেন, "ঐ সাদা ধবধবে মিনি নিস্তব্ধ নিদ্রায় প্রিয়ার বুকের উপর ----নূর দাঁড়াইয়া চোখ বুজিল—চোখে ভাল দেখা যাইতেছিল না। নূর দাঁড়ায় আর এক পা যায়—এইরূপে দশ বার হাত দূরের ব্যবধানটা পার হইয়া মিনির নিকট পৌছিতে তার প্রায় আধ ঘন্টার উপর লাগিল। সময় সময় লুপ্ত জ্ঞানের মতো বলিয়া উঠিতে লাগিল, 'কানাই, কোথায় মিনি-অন্ধকারে কোথায় লইয়া যাইতেছিস—আমাকে বাড়ী নিয়ে চল।' কানাই কোন উত্তর দিতে পারিতেছিল না। মিনি! মিনি!—নড়েও না চড়েও না, মুখও তুলে না। চির নিদ্রামগ্নের মতো স্থির শীতল ও নিশ্চল হইয়া পড়িয়া আছে।"[১৫] খোন্দকার সিরাজুল হকের মতে, এই শোকাহত মিনিকেই একদিন প্রভু জমিলার কবরের ওপর মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।[১৬]

'গোঁয়ার গাদু' আবুল হুসেনের একটি ব্যতিক্রমধর্মী গল্প। এ গল্পে গাদুর জীবন ধারার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিকতার পরিবর্তন রূপটি নাটকীয় সাব-জজ অখিল উদ্দিন আহমদের একমাত্র পুত্র রহমদ্দিন ওরফে গাদু। গ্রামের সকলে তাকে গাদু বলে ডাকে। তার এ নামের পেছনে একটা ইতিহাস রয়েছে-"মুঙ্গেরে গাদুর জন্ম হইয়াছিল। জন্মিয়াই সে এমনি উচ্চ ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছিল—সকলেই মনে করিয়াছিল ও-বাড়ি একটা বলবান তিন বৎসরের শিশু কাঁদিতেছে। সে দেখিতে যেমনি সুশ্রী তেমনি মোটাসোটা গায়ে যেন বেশ খানিক জোর নিয়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। দেখিয়াই তার দাদী বলিয়া উঠিয়াছিল, বাহ বা বা অখিলের যে একটা গাদু ছেলে হইয়াছে।"[১৭] শৈশব কাল থেকে আঠার বছর বয়স পর্যন্ত তার জীবন ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়—গাদু ছিল অত্যন্ত গোঁয়ার। নয় বছর বয়সে পিতা, আঠার বছর বয়সে দাদীমা ও মাকে হারিয়ে গাদু আরো উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে। আবুল হুসেনের ভাষায়, "তাহার (গাদুর) প্রকৃতি এখন যৌবনের অত্যাচারে ভীষণতর উদ্দাম হইয়া পড়িয়াছে। শৈশবে যে চাঞ্চল্য পরের দ্রব্য ও পাখীর উপর দিয়া বহিয়াছিল—তাহা এখন যৌবনে বীভৎস আকার ধরিল। ---- গ্রামের লোক গাদুর অধ:পতন দেখিয়া দূর করিয়া গাঁ হইতে তাড়াইয়া দিয়া গাদুর ঘরখানা ও বিঘা দুই তিন জমি বিক্রয় করিয়া লইল। সেই অবধি গাদুকে চার পাঁচ বৎসর সেইগ্রামে কেহ আর দেখে নাই।"[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

একদিন মতিচ্ছন্ন গাদু মজ:ফরপুরে পিতার কবরের পাশে এসে দাঁড়ায়। এ সময়ে গোঁয়ার গাদুর মন কি এক স্নেহ মাখা হৃদয়ের টানে কঠিন গাদুর পাষাণ হৃদয় পিতা অখিলের কবরের পার্শ্বে গুমরিয়া তরল হইয়া গেল। এরপর থেকে গাদু চরিত্রে আকস্মিকভাবে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। গাদু পরোপকারী হয়ে উঠে।[১৯] মুচি পাড়ার এক মুচির কন্যা খুকীর ওলাওঠা রোগে আক্রান্ত হলে গাদু নিজের জীবন বাজি রেখে ডাক্তার ডাকা, ঔষধ আনা যাবতীয় কাজে গাদু ছিল সবার আগে। এমনি করে গাদুও একদিন ওলাওঠা রোগে আক্রান্ত হয়ে খুকীর জন্য ডাক্তার আনতে যায়। ডাক্তার মুচির মেয়ের চিকিৎসা করতে অসম্মতি জানালে মনুষ্যত্বের এ অবমাননা গাদুকে নূতন করে ভাবিয়ে তোলে—"ডাক্তার মুচি বাড়ি চিকিৎসা করিতে চায় না—ইহার অর্থ সে খুঁজিবার জন্য শুইয়া শুইয়া ভাবিতে শুরু করিল। বিশ্বপাতার যে জলবায়ু সেবন করিয়া ডাক্তারও মানুষ, মুচি ও সেই জলবায়ু সেবন করিয়া মানুষ হইয়াছে। বিশ্বপাতা ডাক্তারকে যতখানি দিতেছেন, মুচিকেও ততখানি দিয়াছেন—কাহাকেও কমবেশী করেন না—তাহার নজরে মুচি ও ডাক্তার সমান। তবে কেন ডাক্তার মুচির চিকিৎসা করে না। এই অসমতাটা গোঁয়ার গাদু কিছুতেই বুঝিতে পারে না।"[২০]

খোন্দকার সিরাজুল হকের মতে, সন্দেহ নেই, এ গল্পে যথেষ্ট নাটকীয়তা আছে এবং আবুল হুসেন অস্পৃশ্যতারূপ অভিশাপ থেকে মুসলমান সমাজকে মুক্ত করার বাসনা ব্যক্ত করেছেন। আর এই প্রচারধর্মিতার কারণেই আবুল হুসেনের অধিকাংশ ছোটগল্পগুলো শিল্প গুণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।[২১] আবুল হুসেনের সাহিত্য সাধনার মূলে রয়েছে হিন্দু-মুসলিম মিলন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমান হিন্দুর সঙ্গে মিলিত হয়ে দেশের সমৃদ্ধিতে এগিয়ে আসুক। 'প্রীতিরকুড়ি' গল্পে ও 'মিলন-মঙ্গল' নাটকে আবুল হুসেনের অনুরূপ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলিম সাহিত্য সমাজ নাটক ও নাট্যাভিনয়কে সংস্কৃতিচর্চার অংশ বলে মনে করতেন এবং সাহিত্য সমাজের অনেকে নাটক রচনা ও নাট্যাভিনয়ের পক্ষে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। এ সমাজের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে আবদুল সালাম খাঁ তাঁর রচিত 'নাট্যাভিনয় ও মুসলমান সমাজ' (১৩৩৩) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। উল্লিখিত প্রবন্ধে তিনি নাটক রচনা ও নাট্যাভিনয়ের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, "প্রথমেই চোখে পড়ে অভিনয়ের বিরাট

Dhaka University Institutional Repository

Appealing শক্তি। সমাজের সাধারণ লোক খুব বিখ্যাত বাগ্মীর বক্তৃতায়ও যত না উপস্থিত হয় তাহার তিনগুণ হয় যে কোন বাজে অভিনয়ে। একদিনের ওথেলোর অভিনয় দুনিয়ার হাজার হাজার ছোটখাটো ইয়াগোর যে অভিজ্ঞতা দিতে পারিবে, তাহা দেওয়া বহু বক্তৃতা ও অসংখ্য কেতাবের পক্ষেও তত সহজ হইবে না। এ কথা জোর করিয়া বলা চলে। ---- অভিনয়ে যে কেবল ধর্মের জয় ও অধর্মের পতনই দেখিবে তাহা নহে, কু-শিক্ষা ও কু-সংস্কারের ফল, একতা, শিক্ষা ও ব্যবসার উন্নতি ----ইত্যাদি দেখিয়া সাধারণের ধারণার যে গতি হইবে, তাহাতে উহা সমাজের পক্ষে কোন অবস্থায় না-জায়েজ তা নয়ই বরং অত্যন্ত জায়েজ বলিলেও বোধ হয় অপরাধ হয় না।"[২২]

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে আবুল হুসেন এ নাটকটি রচনা করেন। নাটকটি সম্পর্কে আবদুল কাদির বলেন, "এর Theme ও সংলাপে আবুল হুসেন যে শুভবুদ্ধি ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতেই রচনাটি হয়েছে মহামূল্য।[২৩] পঞ্চাঙ্ক এ সামাজিক নাটকের মুল চরিত্র নওশের। হিন্দু-মুসলমানের যৌথ উদ্দ্যেগে প্রতিষ্ঠিত আমিনপুর গ্রামের কর্মকেন্দ্রের অধিকর্তা নওশের। নাটকটিতে লেখকের জীবনের ব্রতই নওশেরের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।[২৪] আবুল হুসেন হিন্দু-মুসলিম মিলনে যে স্বপ্ন দেখতেন তার বাস্তব রূপায়ণ দেখতে পাই নাটকটির তৃতীয় অংকের তৃতীয় দৃশ্যে। আমিনপুর কেন্দ্রের নরেন ও সখিনার বিবাহ-বন্ধনের মধ্য দিয়ে। তাদের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রের কর্তা নওশেরের আশীর্বাদ—"এস নরেন, এস সখিনা, জীবনের পথে তোমরা পরস্পর সাথী হও। হাজী সাহেবের দোয়ায় তোমাদের এই বন্ধন চির-সুন্দর হবে, সন্দেহ নাই। আজ আমার জীবনের শেষ কাজ সম্পন্ন হল। আমিনপুরের কর্মকেন্দ্র মিলন-মঙ্গলে পূর্ণ হোক। বাংলা তথা ভারতের নর-নারী এখানকার কর্ম মন্ত্রে দীক্ষিত হোক, এই ভরসা করি।"[২৫] সখিনার পিতা হাজী সাহেবের এই বিবাহে সানন্দে সম্মতি হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় বিরোধ নিরসনের অন্যতম উপায় হিসেবে আন্ত:ধর্মীয় বিবাহ-বন্ধন প্রথার প্রচলন নাটকের পরোক্ষ প্রতিপাদ্য বিষয়।[২৬]

উপরে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একথা নি:সন্দেহে বলতে পারি যে, আবুল হুসেন যে কয়টি ছোটগল্প রচনা করেছেন তাতে গল্পের শিল্প গুণ রক্ষা হয়নি। তার প্রধান কারণ হলো গল্পগুলোতে প্রচারধর্মিতা প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে গল্পগুলো সার্থক হতে

Dhaka University Institutional Repository

পারেনি। দু:স্থ অসহায় মুসলমান নারী সমাজের যে বাস্তব চিত্র মমতাভরে তুলে ধরেছেন, তাতে আবেগাতিশয্য সত্ত্বেও তাঁর পরিচ্ছন্ন দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। মিলন-মঙ্গল নাটকটিতেই আবুল হুসেনের সাহিত্য সাধনার মূল উদ্দেশ্য হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের চূড়ান্ত মিলন উপস্থাপিত হয়েছে।

তথ্য নির্দেশ

১। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ২৯৫-২৯৬

২। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩২-৩৩৩

৩। ঐ, পৃ. ৩৩১

৪। ঐ, পৃ. ৩২৯

৫। ঐ, পৃ. ৩৩১

৬। ঐ, পৃ. ৩৩৭

৭। ঐ, পৃ. ৩৩৯

৮। ড. শাহজাহান মনির, *বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২২৩

৯। ঐ, পৃ. ৩৪০

১০। ঐ, পৃ. ৩৪৪

১১। ঐ, পৃ. ৩৪৭

১২। ঐ, পৃ. ৩৫০

১৩। খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ:সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৩৯৭

১৪। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫১

১৫। ঐ. পৃ. ৩৫৬-৩৫৭

১৬। খোন্দকার সিরাজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৭

Dhaka University Institutional Repository

১৭। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৮

১৮। ঐ. পৃ. ৩৬৩

১৯। ঐ. পৃ. ৩৯৭

২০। ঐ. পৃ. ৩৬৬

২১। খোন্দকার সিরাজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৭

২২। আবদুস সালাম খাঁ, 'নাট্যাভিনয় ও মুসলমান সমাজ' *শিখা*, ১ম বর্ষ, ১৩৩৩, পৃ. ১০১-১০২

২৩। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

২৪। খোন্দকার সিরাজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৮

২৫। *আবুল হুসেন রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

২৬। মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, *জীবনী গ্রন্থমালা-১৩*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৮, আবুল হুসেন অংশ, পৃ. ৭৯

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আবুল হুসেন যে সময়ে সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন সে সময় বাঙালি মুসলমান সমাজের অবস্থা ছিল হিন্দুদের চেয়ে সর্বক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ। তিনিই প্রথম মুসলমানদের অগ্রযাত্রায় অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু সময়টি ছিল আবুল হুসেন তথা বুদ্ধির মুক্তিবাদীদের উদারনৈতিক চিন্তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তবুও তাঁরা পিছ-পা হননি। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' সংগঠন প্রতিষ্ঠা, শিখা (পত্রিকা), তরুণপত্র (পত্রিকা), জাগরণ (পত্রিকা), আল মামুন ক্লাব গঠনসহ [illegible] পত্রিকা ও সংগঠনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তিনি।

চিন্তায় স্বাধীন আবুল হুসেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে কর্মময় জীবন শুরু করেন । এ সময়ই 'সংগঠক' হিসেবে আবুল হুসেনের দক্ষতা ও সার্থকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর দক্ষ নেতৃত্ব এবং সুদূর-প্রসারী চিন্তার ফলেই আজ মুসলমান সমাজ তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু সংস্কারান্ধ মৌলভীরা সে সময় আবুল হুসেনকে সমর্থন তো দেনই নি ববং ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী সাধারণ মুসলমানগণকে এর উল্টো অর্থ করে বুঝিয়েছিলেন।

আবুল হুসেন তাঁর রচনার সর্বত্র সংস্কারমুক্ত, বিকাশশীল, বিজ্ঞান-প্রসূত সমাজ-ব্যবস্থার কথা বলেছেন, যা সমাজকে উদারনৈতিক পরিমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দিকনির্দেশনা দিয়েছিল। তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমঝোতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে উভয়ের মিলন কামনা করতেন এবং মুসলমানের উন্নতি সাধনই (সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি) ছিল তাঁর জীবনের ব্রত।

হযরত মহাম্মদ কর্তৃক প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত ইসলাম ধর্মের প্রতি আবুল হুসেনের ছিল অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি। তিনি ধর্মের গোঁড়ামি, অন্ধ ধর্মানুকরণে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই মুসলমান সমাজকে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অন্ধ ধর্মানুকরণ থেকে মুক্ত ইসলামের মূল সত্য অনুধাবন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন । কিন্তু গোড়া রক্ষণশীল মুসলমান সমাজ তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্যের অর্থ না বুঝে— এর বিপরীতমুখী অবস্থানে আবুল হুসেনের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করেন।

ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থার কারণে এদেশের মুসলমান সমাজ শিক্ষা, সাহিত্য, ও সংস্কৃতিতে পিছিয়ে পড়ে। আবুল হুসেন মুসলমানদের এসব ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার কারণ চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণের দিক উল্লেখপূর্বক মুসলমানদের অগ্রগতি কামনা করেছিলেন। এ সময় মুসলমানগণ নিজেদের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং সমাজে অবস্থান সম্পর্কে ছিলেন বড়ই উদাসীন । আবুল হুসেনই প্রথম মুসলমানদেরকে চেতনাবোধ উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসী হন। তিনি মুসলমানের জাগরণের জন্য হিন্দুদের প্রসঙ্গ টেনেছেন এবং শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমন্বয় করতে চেয়েছেন। তাই তিনি বিভিন্ন দিক থেকে হিন্দুদের অগ্রগতির ইতিহাস তুলে ধরেছেন। তাতেও মুসলমানদের ঘুম ভাঙ্গেনি। মুসলমান সমাজ এর কোনটিতে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করতে সমর্থ হননি। আবুল হুসেন এজন্য মুসলমানদেরকেই দায়ী করেছেন।

আবুল হুসেন মনে করতেন একটি সমাজের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে মুসলমানদের জন্য এসময় এর কোনটিই অনুকূলে ছিল না। তারজন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থা বা শাসন-নীতি এবং শিক্ষা-দীক্ষায় মুসলমানদের খানিকটা অনগ্রসরতা। আবুল হুসেন এ অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে আসা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

আবুল হুসেনের অপর পরিচয় হলো—তিনি ছিলেন একজন আইনবিদ। সেকালে যাঁরা ব্যক্তি আবুল হুসেনকে বা তাঁর সামাজিক কর্মকাণ্ডকে পছন্দ করেননি বা সমর্থন দেননি - তাঁরাও আবুল হুসেনকে আইনজ্ঞ হিসেবে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। সমাজ - সংস্কারক আবুল হুসেন তাঁর রচনায় সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারের পাশাপাশি আইনের সংস্কার সাধনের জন্য নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. মূল গ্রন্থ

আবুল হুসেন রচনাবলী (আবদুল কাদির সম্পাদিত), ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৬৮ ।

আবুল হুসেন নির্বাচিত প্রবন্ধ (মোরশেদ শফিউল হাসান সম্পাদিত), ঢাকা, ১৯৯৭ ।

২. পত্র-পত্রিকা

আবুল কাসেম ফজলুল হক (সম্পা.) ঃ লোকায়ত, ষোড়শবর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৯৮ ।

ঐ, (সম্পা.) ঃ লোকায়ত, ষোড়শবর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৯৮ ।

আবুল ফজল (সম্পা.) ঃ শিখা, পঞ্চম সংখ্যা, ঢাকা, ১৩৩৮ ।

আবুল হুসেন (সম্পা.) ঃ শিখা, ১ম সংখ্যা, ঢাকা, ১৩৩৩ ।

ওয়াকিল আহমদ (সম্পা.) ঃ নিবন্ধমালা, চতুর্থ খণ্ড, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণাকেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৮ ।

ঐ, (সম্পা.) ঃ নিবন্ধমালা, সপ্তম খণ্ড, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণাকেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, জুন-১৯৯২ ।

কাজী আবদুল ওদুদ (সম্পা.) ঃ প্রতিকা, ১ম বর্ষ, ঢাকা, ১৩৩৮ ।

কাজী মোতাহার হোসেন (সম্পা.) ঃ শিখা, ২য় সংখ্যা, ঢাকা, ১৩৩৫ ।

কাজী মোতাহার হোসেন (সম্পা.) ঃ শিখা, ৩য় সংখ্যা, ঢাকা, ১৩৩৬ ।

বিজলী প্রভা সাহা (সম্পা.) ঃ সাহিত্যপত্র, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৮৬ ।

মোহাম্মদ আবদুর রশিদ (সম্পা.) ঃ শিখা, চতুর্থ সংখ্যা, ঢাকা, ১৩৩৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

৩. সহায়কগ্রন্থ (সম্পাদিত)

আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পা.) ঃ কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯২।

ঐ, (সম্পা.) ঃ জীবনীগ্রন্থমালা-১৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮।

সাঈদ-উর রহমান (সম্পা.) ঃ ওদুদ-চর্চা, ঢাকা, ১৯৮২।

ওয়াকিল আহমদ (সম্পা.) ঃ বাঙালীর চিন্তাধারা : আধুনিক যুগ, ঢাকা, ১৯৯০।

রশীদ আল ফারুকী (সম্পা.) ঃ কাজী আবদুল ওদুদ প্রসঙ্গ, চট্টগ্রাম, ১৩৯৪।

ঐ, (সম্পা.) ঃ বাঙালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্যচিন্তা, ঢাকা, ১৯৯১।

৩. সহায়ক সমালোচনাগ্রন্থ

অমলেন্দু দে ঃ বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, কলিকাতা, ১৯৮৭।

আনিসুজ্জামান ঃ মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৪।

আবুল কাসেম ফজলুল হক ঃ বাঙলাদেশের রাজনীতিতে বুদ্ধিজীবিদের ভূমিকা, ঢাকা,১৯৯৭।

আবুল ফজল ঃ রেখাচিত্র, চট্টগ্রাম, ১৯৬৫।

ঐ, ঃ শুভ বুদ্ধি, ঢাকা, ১৯৮৫।

ঐ, ঃ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা, ঢাকা, ১৯৬১।

ঐ, ঃ সমাজ, সাহিত্য, রাষ্ট্র, ঢাকা, ১৯৬৮।

ইমরান হোসেন ঃ বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম, ঢাকা, ১৯৯৩।

এনামুল হক ঃ মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াকিল আহমদ	ঃ	উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৩।
কাজী আবদুল ওদুদ	ঃ	শাশ্বত বঙ্গ, ঢাকা, ১৯৮৩।
কাজী আবদুল মান্নান	ঃ	আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ঢাকা, ১৯৬১।
খান বাহাদুর নাসিরুদ্দিন আহমদ	ঃ	ইসলাম ও মুসলমান, ঢাকা, ১৯৮৫।
খোন্দকার সিরাজুল হক	ঃ	মুসলিম সাহিত্য-সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম, ঢাকা, ১৯৮৪।
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম	ঃ	মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৮।
মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন	ঃ	বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ঢাকা, ১৩৭১।
মোতাহার হোসেন চৌধুরী	ঃ	শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ, ঢাকা, ১৩৪১।
মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন	ঃ	বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, ঢাকা, ১৯৮৫।
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী	ঃ	সমাজ সংস্কার, ঢাকা, ১৩২৬।
মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ	ঃ	বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ আন্দোলন, ঢাকা, ১৯৮০।
শাহজাহান মনির	ঃ	বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা, ঢাকা, ১৯৯৩।
সুশোভন সরকার	ঃ	বাংলার রেনেসাঁস, কলিকাতা, ১৩৯৭।